অরবিন্দের গীতা

শ্রীঅনিলবরণ রায় অনূদিত

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

চতুর্থ খণ্ড

(শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে অনূদিত)
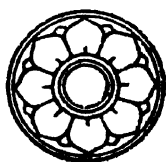
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অনুবাদক
শ্রীঅনিলবরণ রায়

পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার — শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

—:*:—

গীতার পরম বাক্য

এখন আমরা গীতোক্ত যোগের অন্তরতম সারাংশে, উহার শিক্ষার সমগ্র জীবন্ত কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমরা অতি স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, সীমাবদ্ধ মানবাত্মা যখন অহং ও নীচের প্রকৃতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্ত, নীরব, অচল-প্রতিষ্ঠ অক্ষর আত্মার মধ্যে উঠে, সে ঊর্দ্ধগতি কেবল একটা প্রথম ধাপ, একটা প্রারম্ভিক পরিবর্ত্তন মাত্র। আর এখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি, কেন গীতা প্রথম হইতেই ঈশ্বরের উপরে, মানবরূপী ভগবানের উপরে এত ঝোঁক দিয়াছে; তিনি সর্ব্বদাই নিজেকে লক্ষ্য করিয়া (অহং, মাম্) এমনভাবে কথা বলিতেছেন যেন তিনি এক মহান্ গুহ্য ও সর্ব্বব্যাপী সত্তা, জগৎ-সকলের ঈশ্বর, মানবাত্মার প্রভু; এমন কি প্রাকৃত বিশ্ব-জগতের আন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয়সমূহ যাহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সেই চির-শান্ত, অবিচল, অক্ষর, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা অপেক্ষাও মহত্তর।

সকল যোগই হইতেছে ভগবানের সন্ধান, অনন্তের সহিত মিলনের প্রয়াস। ভগবান ও অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি যত পূর্ণ হয়, তদনুযায়ীই হয় সেই সন্ধানের ধারা, সেই মিলনের গভীরতা ও পূর্ণতা এবং সেই সিদ্ধির সমগ্রতা। মানুষ মনোময় পুরুষ, তাহাকে তাহার সান্ত মনের ভিতর দিয়াই অনন্তের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়, এই সান্তেরই কোন সন্নিহিত দ্বার অনন্তের দিকে খুলিয়া ধরিতে হয়। সে এমন কোনও পরিকল্পনার সন্ধান করে যেটিকে তাহার মন ধরিতে পারে, তাহার প্রকৃতির এমন কোনও শক্তিকে সে বাছিয়া লয় যাহা নিজেকে পরমে উন্নীত করিয়া অনন্ত সত্যের দিকে প্রসারিত হইতে পারে, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে, যে সত্যের স্বরূপ তাহার মনের ধারণার অতীত সত্য অনন্ত, সেই জন্যই তাহার আছে অগণ্য মুখ, তাহার অর্থের অগণ্য বাক্য, অগণ্য ব্যঞ্জনা, সেই অনন্ত সত্যের কোনও একটি মুখকে সে দেখিবার চেষ্টা করে, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ অনুভূতির ভিতর দিয়া, সেইটি যাহার একটি রূপ সেই অপরিমেয় সত্যে সে পৌঁছিতে পারে। সে দ্বার যতই সঙ্কীর্ণ হউক, যদি তাহা তাহার আকাঙ্ক্ষিত অনন্ততার দিকে কতকটা দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, তাহার আত্মাকে সে আহ্বান করিয়াছে তাহার অপরিসীম গভীরতা ও দুরারোহ শিখরের দিকে তাহাকে পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলেই সে পরিতুষ্ট হয়। আর যে-ভাবে সে তাহার দিকে অগ্রসর হয়, সেও তাহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে, যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে।

দার্শনিক চিন্তাশীল মন ব্যতিরেকী (Abstractive) জ্ঞানের দ্বারা অনন্তে পৌঁছিতে চায়। জ্ঞানের কার্য্য—অবধারণ করা, আর সান্ত বুদ্ধির

পক্ষে ইহার অর্থ হইতেছে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা, সীমা-নির্দ্ধারণ করা। কিন্তু অনির্দ্দেশ্য বস্তুকে নির্দ্দেশ করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে কোন প্রকার সর্ব্বতোমুখী নেতি নেতি। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় এমন সকল জিনিষকেই মন অনন্তের পরিকল্পনা হইতে বাদ দিতে অগ্রসর হয়। আত্মা ও অনাত্মাকে সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া দেখা হয়; এক শাশ্বত অক্ষর অনির্দ্দেশ্য স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা ও সকল সৃষ্ট জিনিষ, ব্রহ্ম ও মায়া, অনির্ব্বচনীয় সদ্বস্তু ও যাহা কিছু তাহাকে প্রকট করিতে চাহিতেছে কিন্তু পারিতেছে না,—এই সবকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া গণ্য করা হয়; কর্ম্ম ও নির্ব্বাণ, একদিকে বিশ্ব-শক্তির অবিরত অথচ চির-পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্মধারা, অন্যদিকে এক অনির্ব্বচনীয় পরম নিষ্ক্রিয়তা, যেখানে কোনও জীবন নাই, মনোবৃত্তি নাই, কর্ম্মের আর কোনই উপযোগিতা নাই,—ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ধারণা করা হয়। শাশ্বতের দিকে জ্ঞানের এই প্রবল বেগ মানুষকে অনিত্য ও অস্থায়ী সব কিছু হইতেই সরাইয়া লইয়া যায়। জীবনের উৎসে ফিরিবার জন্য উহা জীবনকেই অস্বীকার করে, আমরা যে রূপে প্রতীয়মান হই সে সমস্তই বর্জ্জিত করা হয়, যেন ইহাদের উপরে আমাদের সত্তার যে নামরূপের অতীত সত্য সেখানে পৌঁছিতে পারা যায়। হৃদয়ের বাসনা, ইচ্ছাশক্তির কর্ম্ম, মনের পরিকল্পনা সবই বর্জ্জিত হয়; এমন কি পরিশেষে জ্ঞানও পরম অজ্ঞেয় ও নির্ব্বিশেষ সত্তার মধ্যে নির্ব্বাপিত, নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই যে ক্রমবর্দ্ধমান নিবৃত্তি ও নিশ্চেষ্টতার পথ শেষ পর্য্যন্ত চরম নিষ্ক্রিয়তায় লইয়া যায়, ইহার দ্বারা মায়া-সৃষ্ট আত্মা, অথবা যে সংস্কার-সমষ্টিকে

আমরা "আমরা" বলিয়া অভিহিত করি, নিজের ব্যক্তিত্বভাবের লয় সাধন করে, জীবন-রূপ মিথ্যার অবসান করে, নির্ব্বাণের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কিন্তু এই যে আত্ম-নির্ব্বাণের কঠিন ব্যতিরেকী প্রণালী, ইহা দুই চারিজন অসাধারণ প্রকৃতির লোককে আকৃষ্ট করিলেও, মানুষের মধ্যে দেহধারী আত্মাকে সর্ব্বত্র তৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ পূর্ণতম শাশ্বতের অভিমুখে যাইবার জন্য তাহার বহুমুখী প্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ রহিয়াছে, ইহা সে-সবকে কোনও পথ দেখাইয়া দেয় না। কেবল তাহার ব্যতিরেকী ধ্যানী বুদ্ধিই নহে, তাহার পিপাসু হৃদয়, তাহার কর্ম্মপর ইচ্ছা, তাহার যে ব্যবহারিক মন এমন কোনও সত্যের সন্ধান করিতেছে তাহার নিজের জীবন এবং বিশ্বের জীবন যাহার বিচিত্র প্রকাশ,—এই সবেরই আছে শাশ্বত ও অনন্তের দিকে যাইবার প্রয়াস, তাহার মধ্যেই তাহাদের দিব্য উৎস এবং তাহাদের জীবন ও প্রকৃতির সার্থকতা তাহারা পাইতে চায়। এই প্রয়োজন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ভক্তিমূলক ও কর্ম্মমূলক ধর্ম্মসকল, তাহাদের শক্তি হইতেছে এই যে, তাহারা আমাদের মানবতার সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় ও বিকশিত বৃত্তিসকলকে তৃপ্ত করে, ভগবানের দিকে লইয়া যায়, কারণ ইহাদিগকে লইয়া আরম্ভ করিয়াই জ্ঞান ফলপ্রসূ হইতে পারে। এমন কি বৌদ্ধধর্ম্ম আভ্যন্তরীণ আত্মা ও বাহ্য বস্তু উভয়কেই কঠোর ও অকুণ্ঠভাবে "নেতি" করা সত্ত্বেও নিজেকে প্রথমতঃ কর্ম্মের দিব্য সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ভক্তির স্থলে এক সার্ব্বজনীন প্রেম ও অনুকম্পার অধ্যাত্ম ভাবালুতা আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ কেবল এই ভাবেই তাহার পক্ষে

মানবজাতির জন্য এক সিদ্ধিপ্রদ পন্থা হওয়া, এক বস্তুতঃ মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এমন কি মায়াবাদ যে অতিমাত্রায় যুক্তিতর্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম ও মানসিক সৃষ্টিসকলের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, সেও মানুষকে, বিশ্বকে এবং বিশ্বে ভগবানকে একটা সাময়িক ও ব্যবহারিক সত্তা দিতে বাধ্য হইয়াছে যেন প্রথমে দাঁড়াইবার মত একটা স্থান, ধরিবার মত একটা সূত্র পাওয়া যায়; মানুষের বন্ধন এবং তাহার মুক্তির সাধনাকে কতকটা বাস্তবতা দিবার জন্য মায়াবাদ যেটিকে অস্বীকার করে সেইটিকেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু কর্ম্মমুখী ও হৃদয়াবেগমূলক ধর্ম্মসমূহের দুর্ব্বলতা এই যে, তাহারা ভগবানের কোনও একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপে এবং সান্তেরই দিব্য ভাবসকলে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হইয়া যায়। আর যদি কখনও তাহাদের অনন্ত ভগবদ্‌সত্তা সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা থাকে, তাহারা আমাদিগকে জ্ঞানের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, কারণ তাহারা ইহার পরম ও ঊর্দ্ধতম পরিণতি পর্য্যন্ত যাইতে চাহে না। শাশ্বতের মধ্যে যে পূর্ণ নিমজ্জন এবং একাত্মতার দ্বারা পূর্ণতম মিলন, এই সকল ধর্ম্ম ততদূর পর্য্যন্ত যায় না, —অথচ, সেই একাত্মতাতে মানবাত্মাকে একদিন পৌঁছিতেই হইবে, যদি নেতিমূলক পন্থায় না হয়, যে কোনও উপায়ে, কারণ সেইখানেই রহিয়াছে সকল একত্বের ভিত্তি। অন্যপক্ষে, শুধু ধ্যানপরায়ণ নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতার দুর্ব্বলতা হইতেছে এই যে তাহা এই পরিণতিতে উপস্থিত হয় অতিরিক্ত নেতির দ্বারা, এবং শেষকালে তাহা মানবাত্মাকে একটা অবস্তু বা মিথ্যা কল্পনামাত্র করিয়া তোলে, অথচ বরাবর এই আত্মার আকাঙ্ক্ষার জন্যই ঐ মিলন প্রয়াস, নতুবা তাহার কোন অর্থই থাকে না

কারণ আত্মাকে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়া দিলে মুক্তি ও মিলন সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই চিন্তাধারা মানবজীবনের অন্যান্য শক্তিকে যতটুকু স্বীকার করে, তাহাকে সে প্রথম অবস্থায় নিম্নতর ক্রিয়ার জন্য রাখিয়া দেয়, শাশ্বত ও অনন্তের মধ্যে আসিয়া সে-ক্রিয়া কখনই কোন পূর্ণ বা সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করিতে পায় না। অথচ এই যে সব জিনিষকে তাহা অসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, —সমর্থ ইচ্ছাশক্তি, প্রেমের তীব্র আবেগ, সচেতন মানস সত্তার ব্যবহারিক দৃষ্টি ও সর্ব্বতোমুখী সাক্ষাতোপলব্ধি, এ-সবও আসিয়াছে ভগবান হইতে, তাহারা ভগবানেরই মূল শক্তিসকলের প্রতিরূপ, তাহাদের উৎপত্তিস্থলে তাহাদের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, এবং ভগবানেরই মধ্যে তাহাদের পূর্ণতালাভের একটা জীবন্ত সাধনাও আছে। তাহাদের চূড়ান্ত দাবী পূরণ না করিলে কোনও ভগবদ্‌জ্ঞানই সমগ্র, পূর্ণ বা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক হইতে পারে না। ভগবদ্ সত্তার এই সকল ভাবের পিছনে যে অধ্যাত্ম বস্তু রহিয়াছে, বৈরাগ্যমুখী জিজ্ঞাসার সঙ্কীর্ণতায় তাহাকে নেতি করিয়া অথবা শুদ্ধ জ্ঞানের গর্ব্বে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া কোন বিজ্ঞতাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞ হইতে পারে না।

গীতার যে মুখ্য চিন্তাধারায় গীতার সকল সূত্রগুলি সংগৃহীত ও মিলিত হইয়াছে, তাহার মহত্ত্ব হইতেছে এমন একটি পরিকল্পনার সমন্বয়মূলক শক্তি যাহা বিশ্ব মাঝে মানবাত্মার সমগ্র প্রকৃতিটিরই হিসাব লয়; আর মানুষ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের সন্ধানে, কোনও এক ঊর্দ্ধতম আনন্দ, শক্তি ও শান্তির সন্ধানে যে পরম ও অনন্ত সত্য, শক্তি, প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার সেই বহুমুখী প্রয়োজনকে উদার ও যথাযথ ঐক্য

সাধনের দ্বারা সার্থকতা দেওয়া হয়। এখানে রহিয়াছে ভগবান, মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এক ব্যাপক অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভের দিকে একটা সতেজ ও উদার প্রয়াস। অবশ্য এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সব জিনিষকে নিঃশেষে ধরা হইয়াছে, আর কোনও অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধান হইতে বাকী নাই, এমন নহে; তথাপি এমন এক প্রশস্ত কাঠামো দেওয়া হইয়াছে, যেটিকে কেবল পূরণ করিয়া, পরিস্ফুট করিয়া, সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া, ইঙ্গিতসকলের অনুসরণ করিয়া, অস্পষ্ট স্থানগুলিকে আলোকিত করিয়া, আমরা আমাদের বুদ্ধির অন্যান্য সমস্যারও সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, আমাদের আত্মার অন্যান্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিতে পারি। গীতা নিজে তাহার উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর কোনও সম্পূর্ণ নূতন সমাধান উপস্থিত করে নাই। যে ব্যাপকতা তাহার লক্ষ্য তাহাতে উপনীত হইতে গীতা বিখ্যাত দর্শনগুলিকে ছাড়াইয়া তাহাদের পশ্চাতে উপনিষদের যে মূল বেদান্ত রহিয়াছে সেইখানেই ফিরিয়া গিয়াছে, কারণ সেইখানেই আমরা পাই আত্মা ও মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রশস্ত-তম ও গভীরতম সমন্বয়ের দৃষ্টি। কিন্তু উপনিষদগুলিতে অন্তর্জ্ঞানমূলক দৃষ্টি এবং রূপকাত্মক ভাষার জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদনে আবরিত থাকায় যাহা বুদ্ধির নিকট অনধিগম্য, তাহাকেই গীতা পরবর্ত্তী বুদ্ধিবৃত্তিমূলক চিন্তা ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে।

ব্যতিরেকী চিন্তার দ্বারা যাহারা অনির্দ্দেশ্যের, চির-অব্যক্ত অক্ষরের সন্ধান করে, যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে, গীতা নিজের সমন্বয়ের কাঠামোর মধ্যে তাহাদের পন্থাকেও স্থান দিয়াছে। যাহারা এই পন্থার অনুসরণ করে তাহারাও পুরুষোত্তমকে, পরম দিব্য পুরুষকে, সর্ব্বভূতের

পরম আত্মাকে, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব। কারণ তাঁহার যে উর্দ্ধতম স্ব-প্রতিষ্ঠ ভাব তাহা অচিন্ত্যই, অচিন্ত্যরূপম্, তাহা এক কল্পনাতীত সদ্বস্তু, সারাৎসার পরাৎপর, বুদ্ধির নির্দ্ধারণের বহু উর্দ্ধে। যে নেতিমূলক নিষ্ক্রিয়তা, নীরব নিশ্চলতা, জীবন ও কর্ম্মবর্জ্জনের পন্থা দ্বারা মানুষ এই বোধাতীত নিরুপাধিক বস্তুর সন্ধান করে, গীতার দার্শনিক চিন্তায় তাহা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল একটা গৌণ অনুমতি মাত্র। এই নেতিমূলক জ্ঞান সত্যের কেবল একটা দিককে ধরিয়া শাশ্বতের দিকে অগ্রসর হয়, আর সেই দিকটার অনুসরণ হইতেছে দেহধারী প্রাকৃত জীবের পক্ষে অতিশয় কঠিন, দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে; ইহা এক অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এমন কি অনাবশ্যক দুষ্করতার পথ অবলম্বন করিয়া চলে, ক্ষুরস্য ধারাঃ নিশিতৈব দুরত্যয়া। সকল সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া নহে, পরন্তু সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনন্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সর্ব্বাপেক্ষা সহজভাবে, ব্যাপকভাবে, অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাকে ধরিতে পারে। এই যে বিশ্বমাঝে মানুষের মন, প্রাণ, দেহের জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া পরমেশ্বরকে দেখা, অব্যবহার্য্যম, এইটিও বস্তুতঃ প্রশস্ততম ও সত্যতম সত্য নহে; আর যাহাকে বস্তু-সকলের ব্যবহারিক সত্য বলা হয়, সম্বন্ধ-মূলক সত্য, সেইটিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের, পরমার্থের, সম্পূর্ণ বিপরীত নহে। বরঞ্চ সহস্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আমাদের মানব-জীবনের সহিত পরম শাশ্বত বস্তুর নিগূঢ় স্পর্শ ও সংযোগ রহিয়াছে, আর আমাদের প্রকৃতির এবং বিশ্বের প্রকৃতির সকল মূলধারাকে ধরিয়াই, সর্ব্বভাবেন, সেই স্পর্শকে

সুস্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির নিকট সত্য করিয়া তোলা যায়। অতএব এই অপর পন্থাটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ, সুখম্ আপ্তুম্। ভগবান নিজেকে এমন করিয়া রাখেন নাই যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়, কেবল একটি মাত্র জিনিষের প্রয়োজন, একটি দাবী পূরণ করা চাই, চাই আমাদের অজ্ঞানের আবরণকে দীর্ণ করিবার একাগ্র অদম্য সঙ্কল্প, যাহা সকল সময়েই আমাদের নিকটে রহিয়াছে, আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, যাহা আমাদের মূল সত্তা ও অধ্যাত্মসার, আমাদেব ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার, আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব, চাই তাহাকে মন ও হৃদয় ও প্রাণ দিয়া সমগ্রভাবে, অবিরতভাবে সন্ধান করা। আমাদের পক্ষে কেবল এই একটি জিনিষই কঠিন, বাকী যা কিছু, আমাদের জীবনের পরম অধীশ্বর নিজেই সব দেখিবেন, নিজেই সব সম্পন্ন করিয়া দিবেন, অহম্ ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

গীতার সমন্বয়-মূলক শিক্ষা যেখানে শুদ্ধ জ্ঞানের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক দিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি যে ঠিক সেইখানেই গীতা অবিরত এই পূর্ণতর সত্যের ও অধিকতর ফলদায়ক উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করিয়াছে। বস্তুতঃ, গীতা স্ব-প্রতিষ্ঠ অক্ষর সত্তার উপলব্ধিকে যে-রূপ দিয়াছে তাহাতেই উহা উপলক্ষিত হইয়াছে। মনে হয় বটে যে, সর্ব্বভূতের সেই অক্ষর আত্মা প্রকৃতির কর্ম্মপরম্পরায় সাক্ষাৎভাবে যোগদান না করিয়া সরিয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই অক্ষর আত্মা একেবারে সকল সম্বন্ধ-শূন্য নহে, সকল প্রকার সংযোগ হইতে সুদূরে নহে। তাহা আমাদের সাক্ষী ও ভর্ত্তা; নীরবে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে অনুমতি

দিতেছে, এমন কি উদাসীনভাবে ভোগের আনন্দও গ্রহণ করিতেছে। জীব যখন সেই শান্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠায় অবস্থিত, তখনও প্রকৃতির বহুমুখী ক্রিয়া সম্ভব, কারণ সাক্ষী আত্মা হইতেছে অক্ষর পুরুষ, আর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সকল সময়েই কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নিশ্চেষ্টতা ও সক্রিয়তা একই সঙ্গে দুইটা দিক, ইহার সম্পূর্ণ অর্থটি এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে,—কারণ নিষ্ক্রিয় সর্ব্বব্যাপী আত্মা ভগবানের কেবল একটা দিকের সত্য মাত্র। যিনি এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মারূপে জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহার সকল পরিবর্ত্তনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আবার মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবান, সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, আমাদের সকল আভ্যন্তরীন বিকাশ, এবং সকল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বাস্তব কর্ম্মধারার সচেতন কারণ ও প্রভু। যিনি যোগীদের ঈশ্বর, তিনিই জ্ঞান-পন্থীদের ব্রহ্ম, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী আত্মা, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী ভগবান।

লৌকিক ধর্ম্মসকলের যে সীমাবদ্ধ সগুণ ভগবান, এই ভগবান তাহা নহেন; কারণ সে-সব হইতেছে ইঁহার কেবল আংশিক ও বাহিক রূপায়ণ; ভগবানের সত্তার যে পরিপূর্ণ সত্য ইনি তাহারই সগুণতার দিক, স্রষ্টা ও পরিচালক। ইনি হইতেছেন অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, আত্মা, সত্তা,—সকল দেবতারা তাঁহার এক একটি দিক, সকল ব্যষ্টিগত রূপ বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহারই খণ্ড বিকাশ। ভক্তের যে ইষ্ট-দেবতা, ভক্ত তাহার বুদ্ধি দিয়া ভগবানের যে বিশিষ্ট নামরূপের পরিকল্পনা করে, বা যে বিগ্রহ তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী, ইনি তাহা নহেন। যিনি সকল ভক্তের, সকল ধর্ম্মের ঈশ্বর, এই সমস্ত নাম-রূপ সেই এক

দেবের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন মুখ; কিন্তু ইনি নিজেই সেই বিশ্ব-দেব, দেব-দেব। এই ঈশ্বর ভ্রমাত্মিকা মায়ায় নির্গুণ অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র নহেন; কারণ সকল বিশ্বের অতীতে থাকিয়া, আবার ইহার মধ্যেও থাকিয়া তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এবং তিনি জগৎ-সকলের এবং জাগতিক জীবসকলের অধীশ্বর। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর কারণ তিনি পরম আত্মা ও পরম পুরুষ, এবং তাঁহার উর্দ্ধতম মূল সত্তা হইতে তিনি এই বিশ্বকে উৎপন্ন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন, নিজেকে মোহাবিষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বশক্তিমত্ত লইয়া। আর বিশ্বমাঝে তাঁহার দিব্য প্রকৃতির যে লীলা সেটিও তাহার কিম্বা আমাদের চেতনার একটা ভ্রান্তিমাত্র নহে। একমাত্র ভ্রমাত্মিকা মায়া হইতেছে নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান; তাহা এক অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্যের অলক্ষ্য ভূমিকার উপরে অসদ্‌বস্তুসকল সৃষ্টি করিতেছে না, পরন্তু তাহার ক্রিয়া অন্ধ, ভারাক্রান্ত, সীমাবদ্ধ, সেইজন্য সৃষ্টির গভীরতর সত্যসকলকে সে অহংয়ের রূপের, মন, প্রাণ, জড়ের অন্যান্য অসম্পূর্ণ-রূপের ভিতর দিয়া বিকৃতভাবে মানব-মনের সম্মুখে ধরিতেছে। এক পরা ভগবদ্-প্রকৃতি আছে, তাহাই এই বিশ্বের প্রকৃত সৃজনকর্ত্রী। সকল জীব, সকল বস্তু সেই একই ভগবদ্ সত্তার বিভিন্ন রূপ; সকল জীবন-লীলা একই ঈশ্বরের শক্তির লীলা; সকল প্রকৃতি একই অনন্তের অভিব্যক্তি। তিনি মানুষের অন্তরে ভগবান; জীব তাঁহারই সত্তার সত্তা। তিনি বিশ্বের মধ্যে ভগবান; এই দেশ ও কালের জগৎ তাহারই প্রাতিভাসিক আত্ম-বিস্তার।

সৃষ্টির ও সৃষ্টির অতীত সত্য সম্বন্ধে দৃষ্টির এই ব্যাপকতার জন্যই

গীতোক্ত যোগ তাহার সমন্বয়মূলক সার্থকতা ও অতুলনীয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যাহা কিছু আছে সে-সবের মধ্যে এই পরম ভগবান অপরিবর্ত্তনীয়, অবিনশ্বর আত্মা, অতএব এই পরিবর্ত্তনরহিত, বিনাশরহিত আত্মার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে মানুষকে জাগ্রত হইতে হইবে, এবং ইহার সহিত তাহার আভ্যন্তরীণ নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে যুক্ত করিতে হইবে। তিনি মানুষের অন্তরস্থিত ভগবান, মানুষের সকল ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছেন, পরিচালন করিতেছেন; অতএব মানুষকে তাহার অন্তরস্থিত ভগবান সম্বন্ধে জাগ্রত হইতে হইবে, যে ভাগবৎ সত্তাকে সে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাকে জানিতে হইবে, যাহা কিছু ইহাকে আবৃত করিয়া রাখে, আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সে-সবকেই ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, এবং তাহার আত্মার এই অন্তরতম আত্মার সহিত যুক্ত হইতে হইবে, তাহার চৈতন্যের মহত্তর চৈতন্য, তাহার সকল ইচ্ছা সকল কর্ম্মের প্রচ্ছন্ন অধীশ্বর, তাহার মধ্যে এই যে সত্তা অবস্থিত রহিয়াছে—যাহা তাহার বিভিন্ন আত্ম-প্রকাশের মূল ও লক্ষ্য, তাহার সহিত তাহাকে যুক্ত হইতে হইবে। ভগবান তিনি, তাঁহার যে দিব্য প্রকৃতি আমরা যাহা কিছু সেই সমুদয়ের মূল, তাহা এই সব নীচের প্রাকৃত সৃষ্টির দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অতএব মানুষকে তাহার নীচের আপাতদৃশ্য জীবন হইতে, এই অপূর্ণ ও মৃত্যুময় জীবন হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহার সেই মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে যাহার স্বরূপ অমৃতত্ব ও পূর্ণতা। এই ভগবান যাহা কিছু আছে সকল বস্তুর মধ্যে এক, তিনি সেই আত্মা যাহা সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে সর্ব্বভূত রহিয়াছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে; অতএব মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইবে সকল

জীবের সহিত তাহার অধ্যাত্ম ঐক্য, সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখিতে হইবে, এমন কি সকল বস্তু সকল জীবকে আপনার মত করিয়াই দেখিতে হইবে, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র, এবং তদনুযায়ী তাহার সকল মনে, ইচ্ছায়, জীবনে চিন্তা করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে। এখানে বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে, এই ভগবানই সে সমুদয়ের আদি, এবং তিনি তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা এই অসংখ্য সৃষ্ট বস্তু হইয়াছেন, অভূৎ সর্ব্বভূতানি; অতএব মানুষকে চেতন অচেতন সকল বস্তুর মধ্যেই সেই এক অদ্বিতীয়কে দেখিতে হইবে, আরাধনা করিতে হইবে, সূর্য্যে, নক্ষত্রে, পুষ্পে তাঁহার যে প্রকাশ, মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন গুণ ও শক্তির মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, সবেরই পূজা করিতে হইবে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য ঐক্যানুভূতির দ্বারা এবং সর্ব্ব শেষে নিবিড় আভ্যন্তরীণ একত্বের দ্বারা তাহাকে বিশ্বের সহিত এক বিশ্ব-ব্যাপকত্ব লাভ করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট, সকল সম্বন্ধ-রহিত একত্বের মধ্যে প্রেম ও কর্ম্মের কোনও স্থান নাই, কিন্তু এই যে বৃহত্তর ও পূর্ণতর ঐক্য, ইহা কর্ম্ম ও শুদ্ধ হৃদয়াবেগের ভিতর দিয়া নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তোলে, ইহাই হইয়া উঠে আমাদের সকল কর্ম্মের, সকল অনুভবের, উৎস, সারবস্তু, প্রেরণা, দিব্য উদ্দেশ্য। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম, কোন্ দেবতাকে আমরা আমাদের সমগ্র জীবন ও কর্ম্ম অর্পণ করিব? ইনিই সেই ভগবান, সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের আত্মবলি দাবী করিতেছেন। নিশ্চেষ্ট, সকল সম্বন্ধ-শূন্য যে একত্ব, তাহার মধ্যে পূজা ও ভক্তির আনন্দের কোনও স্থান নাই; কিন্তু এই যে সমৃদ্ধতর,

পূর্ণতর, নিবিড়তর মিলন, ইহার আত্মা ও হৃদয় ও শীর্ষ হইতেছে ভক্তি। এই ভগবানই আমাদের পিতা, মাতা, প্রেমাস্পদ, বন্ধু সকল সম্বন্ধের পূর্ণ পরিণতি, সকল জীবের আত্মার আশ্রয়। তিনিই গুহ্যবিদ্যার বিষয় সেই এক পরম ও বিশ্ব-দেব, আত্মা, পুরুষ, ব্রহ্ম, ঈশ্বর। তিনি তাঁহার দিব্য যোগের দ্বারা এই সকল ভাবেই জগৎকে নিজের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন। ইহার অসংখ্য সত্তা সকল তাঁহার মধ্যে এক এবং তিনি তাঁহাদের মধ্যে নানারূপে, নানাভাবে এক। মানুষের দিক দিয়া সেই দিব্য যোগ হইতেছে, যুগপৎ তাঁহার এই সকল ভাবে আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া।

এইটিই যে তাহার শিক্ষার পরম ও পূর্ণ সত্য, তিনি যাহা প্রকাশ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এইটিই যে সেই সমগ্র জ্ঞান, তাহা সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দেহভাবে স্পষ্ট করিবার জন্ম অবতার-পুরুষ এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলেন তাহার সার সঙ্কলন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, ইহাই তাহার পরম বাক্য, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ভূয়ঃ এব শৃনু মে পরমম্ বচঃ। আমরা দেখিতে পাই গীতার এই পরম বাক্য হইতেছে, প্রথমতঃ, এই স্পষ্ট ঘোষণা যে, সৃষ্টিতে যাহা কিছু রহিয়াছে সে-সবেরই পরম ও দিব্য উৎস-রূপে, সকল বস্তু যাহার সত্তা হইতে উদ্ভূত, জগতের এবং জগৎবাসী সকল জীবের মহান্ অধীশ্বর-রূপে শাশ্বতকে জানা ও আরাধনা করা,—ইহাই হইতেছে শাশ্বতের উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম আরাধনা। দ্বিতীয়তঃ, ইহা হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়কে শ্রেষ্ঠতম যোগ বলিয়া ঘোষণা, শাশ্বত ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হইলে, মানুষের পক্ষে এইটিই হইতেছে নির্দ্ধারিত ও স্বাভাবিক পন্থা। পন্থাটির এই সংজ্ঞাকে আরও

অর্থগৌরবপূর্ণ করিবার নিমিত্ত, এবং এই যে-ভক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের দিকে উন্মুক্ত এবং ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা-শক্তিস্বরূপ, ইহার শ্রেষ্ঠতাকে সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, শিষ্যের হৃদয় ও মন দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন এখানে সূচিত হইল ; এই ধারার অনুসরণ করিয়াই অতঃপর মানব-যন্ত্র অর্জ্জুনের প্রতি কর্ম্মের চরম আদেশ প্রদত্ত হইবে। ভগবান বলিলেন,* "তোমার আত্মার কল্যাণকামনায় এই পরম বাক্য আমি তোমাকে বলিব, কারণ তোমার হৃদয় এখন আমাতেই প্রীতি অনুভব করিতেছে", তে প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি। কারণ ভগবানে হৃদয়ের এই যে প্রীতি, ইহাই হইতেছে যথার্থ ভক্তির সমগ্র সার ও উপাদান। পরম বাক্যটি উচ্চারিত হইবামাত্র অর্জ্জুনকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে হইল, কি উপায়ে ব্যবহারতঃ প্রকৃতির সকল বস্তুতেই ভগবানকে দেখিতে পারা যায়। এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ ও সহজ পরিণাম হইল ভগবানকে বিশ্বের আত্মা-রূপে দর্শন, এবং সেই সঙ্গেই জগতের যুগান্তর-কারী কর্ম্মের জন্য মহান্ আদেশ সংঘোষিত হইল।

গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে পরিকল্পনাকে সৃষ্টির সমগ্র রহস্য বলিয়া, মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বলিয়া জোর দিয়াছে, তাহার দ্বারা বিশ্বাতীত আনন্ত্যের সহিত কালাধীন বিশ্ব-লীলার সমন্বয় সাধিত হয়, অথচ উভয়ের কোনটিকেই অস্বীকার করা হয় না, কাহারও বাস্তবতা কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ

---

* ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাময়া॥ ১০।১

করা হয় না। সর্ব্বেশ্বরবাদ তত্ত্ব, ঈশ্বরবাদ তত্ত্ব, উচ্চতম বিশ্বাতীত সত্তা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, আমাদের আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধির এই সকল বিভিন্ন ধারার মধ্যে গীতা সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। ভগবান অজ, শাশ্বত, অনাদি; যাহা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এমন কোনও বস্তু নাই, থাকিত পারে না, কারণ তিনি এক অদ্বিতীয় ও কালাতীত ও পূর্ণতম পরম বস্তু। "কি দেবগণ, কি মহর্ষিগণ, কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নহেন···যিনি আমাকে অজ অনাদি বলিয়া জানেন"*···এইগুলিই হইতেছে সেই পরম বাক্যের প্রথম কথা। আর তাহা এই সমুচ্চ আশ্বাস দিতেছে যে, এই জ্ঞান সঙ্কীর্ণ মানসিক জ্ঞান নহে, পরন্তু শুদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞান,—কারণ তাঁহার রূপ ও প্রকৃতি (যদি বিশ্বাতীত পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা চলে) মনের ধারণার অতীত, অচিন্ত্যরূপ,—এই জ্ঞান মর মানবকে অজ্ঞানের সকল মোহ হইতে এবং পাপের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। যে মানবাত্মা এই পরম অধ্যাত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে বাস করিতে পারে, সে ইহার দ্বারা বিশ্বের মনঃকল্পিত ভাবমূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সকলের উর্দ্ধে উত্তোলিত হয়। সে এমন এক ঐক্যের অনির্ব্বচনীয় শক্তির মধ্যে উঠিয়া যায় যাহা সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে, অথচ সকলকেই সার্থক

---

* ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ় স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০।২,৩

করিয়া তুলিতেছে; তাহা এখানেও যেমন, উর্দ্ধেও তেমনিই। বিশ্বাতীত অনন্ত সম্বন্ধে এই যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সর্ব্বেশ্বরবাদের (Pantheism) সঙ্কীর্ণতা অতিক্রমিত হয়। যে অদ্বৈতবাদ ভগবানকে বিশ্বের সহিত এক বলিয়া দেখে, সে তাহার পরিকল্পিত অনন্ত ভগবানকে তাঁহার বিশ্ব-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, এবং সেইটিকেই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ যে উপলব্ধি, উহা আমাদিগকে দেশ ও কালের অতীত শাশ্বতের মধ্যে মুক্তি দেয়। অর্জ্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কি দেব, কি দানব, কেহই তোমার অভিব্যক্তি জানে না", সমগ্র বিশ্ব, এমন কি অসংখ্য বিশ্ব মিলিয়াও তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি, অনন্ত মহত্ত্ব ধারণ করিতে পারে না। অন্যান্য নিম্নতর যে ভগবদ্‌জ্ঞান, বিশ্বাতীত ভগবানের চির অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় সত্তাকে ধরিয়াই তাহারা প্রকৃত সত্য হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ইহাও সত্য যে, বিশ্বাতীত ভগবদ্ সত্তা কেবল একটা নেতি নহে, অথবা বিশ্বের সহিত সকল সম্বন্ধশূন্য নির্ব্বিশেষ তৎস্বরূপ নহে। তাহা এক পরম সদ্বস্তু, সকল পূর্ণতার পূর্ণতা। বিশ্বের সকল সম্বন্ধ এই পরম হইতেই উদ্ভূত; সকল বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁহার মধ্যেই ফিরিয়া যায় এবং কেবল তাঁহার মধ্যে গিয়াই তাহাদের সত্য এবং অপরিমেয় সত্তা প্রাপ্ত হয়। "কারণ আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বথা উৎপত্তির হেতু।" দেবতাগণ হইতেছেন সেই সকল অক্ষয় শক্তিপুঞ্জ ও অমর ব্যক্তি, যাঁহারা সজ্ঞানে বিশ্বের আন্তরিক ও বাহিক শক্তিসমূহকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, গঠন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন।

দেবতাগণ হইতেছেন শাশ্বত ও আদি দেবের আধ্যাত্মিক রূপ, তাঁহারা তাঁহা হইতেই নামিয়া আসিয়াছেন জগতের বহুমুখী ক্রিয়ার মধ্যে। দেবতারা বহু ও বিশ্বরূপী,—তাঁহারা সত্তার মূল তত্ত্বগুলি এবং তাহার সহস্র বৈচিত্র্য লইয়া একের এই নানামুখী লীলা রচনা করিতেছেন। তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্ব, প্রকৃতি, শক্তি, ক্রিয়া, সমস্তই সর্ব্বপ্রকারে, সকল সূত্রে এবং প্রত্যেক অংশে সেই বিশ্বাতীত অনির্ব্বচনীয় সত্তা হইতে আসিতেছে। এই দিব্য প্রতিনিধিগণের দ্বারা এখানে কিছুই স্বাধীন-ভাবে সৃষ্ট হয় না, কোনও জিনিষই নিরপেক্ষভাবে উদ্ভাবিত হয় না; প্রত্যেক বস্তুর মূল ও কারণ, তাহার সত্তার ও আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তির আধ্যাত্মিক হেতু রহিয়াছে বিশ্বাতীত ভগবানের মধ্যেই, অহম্ আদিঃ সর্ব্বশঃ। বিশ্বের কোনও জিনিষেরই প্রকৃত কারণ বিশ্বের মধ্যে নাই, সমস্তই আসিতেছে সেই বিশ্বাতীত সত্তা হইতে।

যে-সকল মহর্ষিকে বেদের ন্যায় এখানেও সপ্ত আদি ঋষি বলা হইয়াছে,* মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে, তাঁহারা হইতেছেন ভগবদ্ প্রজ্ঞার ধী-শক্তি; সেই প্রজ্ঞা নিজের আত্ম-চেতন অনন্ততা হইতে সকল বস্তুকে উৎপন্ন করিয়াছে, প্রজ্ঞা পুরাণী,—নিজের মূল সত্তার সাতটি ধারার ক্রম অনুসারে বিকশিত করিয়াছে। এই ঋষিগণ হইতেছেন, বেদের সপ্ত ধীয়াঃ, সর্ব্ব-ধারক, সর্ব্ব-উদ্ভাসক, সর্ব্ব-প্রকাশক সপ্ত ধী-শক্তির বিগ্রহ-মূর্ত্তি— উপনিষদ সকল জিনিষকেই বর্ণনা করিয়াছে সপ্তে সপ্তে সাজানো।

* মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ১০।৬

ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে মানবের পিতা চারি শাশ্বত মনু, চত্বারো মনবস্তথা,—কারণ ভগবানের যে কর্ম্মপরা প্রকৃতি তাহা চতুর্মুখী, এবং মানুষ তাহার চতুর্মুখী স্বভাবের ভিতর দিয়া এই প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে। ইহারাও মানসিক সত্তা, ইহাদের নাম হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। জীবনের যে-সব ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই, তাহারা নির্ভর করিতেছে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট মনের উপর; উহারা হইতেছেন এই সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতের এই সকল সজীব প্রাণী তাঁহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে; সকলেই তাঁহাদের সন্তান, যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ। আর এই সকল মহর্ষি এবং এই চারি মনু, ইঁহারা নিজেরাও হইতেছেন পরমাত্মার নিত্য মানস সৃষ্টি, মদ্‌ভাবা মানসা জাতা, তাঁহার বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম সত্তা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত,—তাঁহারা স্রষ্টা, কিন্তু বিশ্বের যত স্রষ্টা তিনিই তাঁহাদের স্রষ্টা। সকল অধ্যাত্ম সত্তার অধ্যাত্ম সত্তা, সকল অন্তরাত্মার অন্তরাত্মা, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, সকল রূপের আভ্যন্তরীন সার বস্তু, এই বিশ্বাতীত পরম পুরুষ আমরা যাহা কিছু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু নহেন, অন্য পক্ষে আমাদের ও জগতের, সত্তার ও প্রকৃতির, সকল সূত্র, সকল শক্তি তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট, তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাসিত।

আমাদের জীবনের এই যে বিশ্বাতীত উৎস, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে কোনও অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের বিচ্ছেদ নাই, যে-সকল জীব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি তাহাদিগকে অস্বীকার করেন না, অথবা তাহাদিগকে কেবল মায়ার বিজৃম্ভন বলিয়া উড়াইয়া দেন না। তিনি সৎ (the Being), আর সব কিছু তাঁহারই প্রকাশ (becomings).

তিনি একটা শূন্য হইতে, একটা "নাস্তি" হইতে, অথবা একটা অবাস্তব স্বপ্নের মধ্য হইতে সৃষ্টি করেন না। তিনি নিজের মধ্য হইতেই সৃষ্টি করেন, নিজেই সৃষ্ট হন; সকলেই তাঁহার সত্তার মধ্যে, সকলেই তাঁহার সত্তার অংশ। এই যে সত্য, ইহা সর্ব্বেশ্বরবাদমূলক দৃষ্টিকে স্বীকার করিয়াও অতিক্রম করিয়া যায়। বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, কিন্তু বিশ্বে যাহা কিছু আবির্ভূত সে সমুদয়ই বাসুদেব এই জন্য যে, যাহা কিছু এখানে আবির্ভূত হয় নাই, যাহা কিছু কখনও প্রকট হয় না সে-সবও তিনি। তাঁহার সত্তা তাঁহার প্রকাশের দ্বারা কোনোরূপে খণ্ডিত হয় না; এই সম্বন্ধের জগতের দ্বারা তিনি এতটুকুও সম্বদ্ধ নহেন। যখন তিনি সব কিছু হইতেছেন তখনও তিনি বিশ্বাতীত; যখন তিনি সান্ত রূপ গ্রহণ করিতেছেন তখনও তিনি নিত্য অনন্ত। প্রকৃতি (Nature) তাহার মূল সত্তায় তাঁহারই অধ্যাত্ম শক্তি, আত্মশক্তি; এই অধ্যাত্ম আত্মশক্তি বস্তুসকলের প্রকাশের জন্য তাহাদের আভ্যন্তরীন প্রকৃতি স্বরূপ অসংখ্য মূল গুণ সৃষ্টি করে এবং তাহাদিগকেই বাহিরের রূপে ও কর্ম্মে প্রকট করে। কারণ সে শক্তির যে মৌলিক, নিগূঢ়, দিব্য ক্রম-বিন্যাস তাহাতে প্রত্যেক বস্তুরই অধ্যাত্ম সত্যটি আসে প্রথমে, তাহা হইতেছে প্রকৃতির গভীরতম একত্বের জিনিষ; যে গুণ ও প্রকৃতি তাহাদের মনস্তত্ত্বের সত্য তাহার মধ্যে যথার্থ বস্তু যাহা আছে সে-সব নির্ভর করিতেছে ঐ অধ্যাত্ম সত্যের উপর, তাহা আত্মা হইতেই উদ্ভূত; রূপ ও কর্ম্মের যে বাহ্যিক সত্য প্রয়োজনীয়তায় ন্যূনতম এবং ক্রমবিন্যাসে সর্ব্বশেষ, তাহা প্রকৃতির আভ্যন্তরীন গুণ হইতে উদ্ভূত, এবং বাহ্য জগতে এই সকল বিচিত্র প্রকাশের জন্য সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপর নির্ভর

করে। অথবা অন্য কথায় বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সত্য হইতেছে কেবল অন্তরাত্মার শক্তিসমষ্টির বহিপ্র্রকাশ, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের পিছনে তাহাদের বহিপ্র্রকাশের অধ্যাত্ম কারণটি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই যে সান্ত বাহ্য সৃষ্টি, ইহার ভিতর দিয়া অনন্ত ভগবানই প্রকটিত হইতেছেন। অপরা প্রকৃতি প্রকৃতির গৌণরূপ; অনন্তের মধ্যে সংযোজনার যে বহু সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকটির একটা অধস্তন পরিণতি হইতেছে এই অপরা প্রকৃতি। সত্তার আত্মপ্রকাশের যে মূল গুণ ও ধারা তাহা হইতে উদ্ভূত এই সকল সংযোজনা, রূপ ও শক্তির, কর্ম্ম ও গতির সংযোজনা, ইহারা জগৎ ঐক্যের মধ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সম্বন্ধ ও পারস্পরিক অনুভূতি উপলব্ধির জন্য। আর এই নীচের বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান ব্যবস্থায়, ভগবানের প্রকাশ-শক্তি-রূপা প্রকৃতি এক মোহাচ্ছন্ন বিশ্ব-গত অবিদ্যার বিকৃতির দ্বারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অনুভূতির জড়ানুগত, ভেদাত্মক ও অহংভাবমূলক ক্রিয়ায় নিজের দিব্য সত্যসকলকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এখানেও সব কিছুই ভগবান হইতে আসিতেছে, সব কিছুই হইতেছে প্রভাব, ভাব, প্রবৃত্তি, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্য হইতে প্রকৃতির ক্রিয়ার ভিতর দিয়া বিকাশ-ধারা। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে; "আমি সকলের উৎপত্তিস্থল, আমা হইতে বাহির হইয়া সকলে কর্ম্ম ও গতির বিকাশে চলিয়াছে।" আর ইহা কেবল সেই সব জিনিষের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে যাহাদিগকে আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি এবং দিব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, যে-সব হইতেছে জ্যোতির্ম্ময়, সাত্ত্বিক, নৈতিক, শান্তিপ্রদ,

অধ্যাত্মভাবে আনন্দপ্রদ,* "বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা ও দান।" পরন্তু ইহা সেই সব বিপরীত জিনিষ সকলের পক্ষেও সত্য যাহারা মর মানবের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে এবং অজ্ঞান ও তাহার সংমোহ লইয়া আসে, "সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু, ভয় ও অভয়, যশ ও অযশ" আর এইরূপ বাকী যাহা কিছু জ্যোতি ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ হইতে উত্থিত, যে-সব অসংখ্য মিশ্রিত তন্ত্রী এমনই বেদনায় স্পন্দিত হইতেছে, অথচ আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধীন মন ও তাহার অজ্ঞান ভাব সকলে জড়িত হইয়া অনবরত উত্তেজনায় শিহরিত হইতেছে। জীবগণের এই সব পৃথক পৃথক ভাব এক মহান্ আত্ম-প্রকাশধারার অন্তর্গত, এবং যিনি ইহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন তাঁহা হইতেই তাহারা তাহাদের উদ্ভব ও সত্তা লাভ করিয়াছে। বিশ্বাতীত সত্তা এই সমুদয় জিনিষকে জানেন এবং সৃষ্টি করেন, কিন্তু এই পৃথগ্‌ভূত জ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন না, নিজের সৃষ্টির দ্বারা অভিভূত হন না। এখানে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে ভূ ধাতু (to become, হওয়া) হইতে উৎপন্ন তিনটি কথাকে কেমন একত্র করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে, ভবন্তি, ভাবাঃ, ভূতানাম্। ভগবান নিজেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছেন, ভূতানি; সমস্ত আভ্যন্তরীন অবস্থা ও ক্রিয়া তাঁহার

* বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ১০।৪, ৫

এবং তাহাদের মানসিক ভাব, ভাবাঃ। এই সকলও,—যেমন আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাবসকল ঠিক তেমনিই আমাদের নিম্নতর আভ্যন্তরীন ভাবসকল এবং তাহাদের পরিদৃশ্যমান পরিণামসকল, সমস্তই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভবন্তি মত্ত এব*। গীতা সত্তা এবং তাহার প্রকাশ এই দুইয়ের প্রভেদ স্বীকার করিয়াছে এবং এই প্রভেদের উপর জোর দিয়াছে, কিন্তু এই প্রভেদকে বিরোধ বলিয়া প্রতিপন্ন করে নাই। কারণ তাহা হইলে বিশ্বগত একত্বকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। ভগবান এক, তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তায় এক, বস্তুসকলের এক সর্ব্বব্যাপী আধার-রূপে এক, তাঁহার বিশ্ব-প্রকৃতির একত্বে এক। এই তিনই এক অদ্বিতীয় ভগবান; সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত, সকলেই তাঁহার সত্তার প্রকট রূপ, সকলেই শাশ্বতের সনাতন অংশ অথবা কালাধীন প্রকাশ। যদি আমাদিগকে গীতার অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্বাতীত পরম সত্তার মধ্যে সকল জিনিষের চরম নির্ব্বাণ অনুসন্ধান করা চলিবে না, পরন্তু সেইখানেই তাহাদের রহস্যের সুমীমাংসা সন্ধান করিতে হইবে, তাহাদের জীবনের সমন্বয়সাধক সত্যের সন্ধান করিতে হইবে।

কিন্তু অনন্তে আরও একটি পরম সত্য আছে, সেইটিকেও মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের অপরিহার্য্য অংশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সত্য হইতেছে এই যে, বিশ্বের দিব্য নিয়ন্তা তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ

* যথা উপনিষদে, আত্মা এব অভূৎ সর্ব্বভূতানি, আত্মাই সর্ব্বভূত হইয়াছে; এখানে শব্দগুলির নির্ব্বাচনে এই ব্যঞ্জনা নিহিত রহিয়াছে যে, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাই এই সর্ব্বভূত হইয়াছে।

করিতেছেন, আবার ইহার মধ্যেও নিবিড়ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন : যে পরমেশ্বর নিজে এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছেন, অথচ ইহাকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত কোনো ইচ্ছাশক্তি-শূন্য কারণ মাত্র নহেন। এমন নহেন যে, এই জগৎ তাঁহার অনিচ্ছাকৃত সৃষ্টি এবং তাঁহার বিশ্ব-শক্তির এই সকল পরিণামের জন্য তিনি কোনরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেন না, অথবা তাঁহার চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ভ্রমাত্মিকা চৈতন্যের উপর, মায়ার উপর, ঐ সবকে আরোপ করেন, কিম্বা সৃষ্টিকে এক যন্ত্রবৎ অন্ধনিয়মের বশে, অথবা কোনো প্রতিনিধির হস্তে, অথবা পাপ ও পুণ্যের চির-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছাড়িয়া দেন। এমন নহে যে, তিনি উদাসীন সাক্ষীরূপে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন, নির্ব্বিকারভাবে অপেক্ষা করিতেছেন কখন সব কিছু নিজদিগকে লুপ্ত করিয়া দিবে, অথবা তাঁহার অবিচল আদি তত্ত্বের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। তিনি জগৎ ও জনসমূহের মহান্ ঈশ্বর, লোকমহেশ্বরম্, তিনি শুধু জগতের মধ্যে থাকিয়াই নহে, পরন্তু ঊর্দ্ধ হইতেও, তাঁহার পরম বিশ্বাতীত পদ হইতেও জগতকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে, এমন কোনো শক্তির দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হইতে পারে না। জগতের উপর এক দিব্য নিয়মের রাজত্ব চলিতেছে, ইহা বলিলে বুঝায় যে, ইহার উপরে এক সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তার প্রভুত্ব রহিয়াছে, কোনো যন্ত্রবৎ শক্তির বা বিশ্বের আপাতদৃশ্য রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো অলঙ্ঘ্য অন্ধ নিয়তির নহে। এইটিই হইতেছে জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরবাদমূলক (theistic) দৃষ্টি, কিন্তু যে ঈশ্বরবাদ সঙ্কোচের সহিত অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয় এবং জগতের বৈপরীত্যসকলের দিকে সোজাভাবে চাহিয়া দেখিতে ভয় পায়,

ইহা সেরূপ ঈশ্বরবাদ নহে, ইহা দেখে ভগবান সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, এক অদ্বিতীয় আদিদেব, তিনি শুভ অশুভ, সুখ দুঃখ, জ্যোতি অন্ধকার সব কিছুই নিজের সত্তার উপাদান-রূপে নিজের মধ্যে প্রকট করিতেছেন, এবং নিজের মধ্যে যাহা প্রকট করিয়াছেন, নিজেই তাহা পরিচালন করিতেছেন। ইহার বৈপরীত্যসকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিজের সৃষ্টির দ্বারা তিনি কোনোরূপে সীমাবদ্ধ হন না, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও তিনি তাহার সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহার জীবগণের সহিত অতি অন্তরঙ্গভাবে এক, তাহাদের মূল অধ্যাত্ম সত্তা, আত্মা, ঊর্দ্ধতম চিৎশক্তি, তাহাদের প্রভু, প্রণয়ী, বন্ধু, আশ্রয়, তিনি তাহাদের মধ্যে থাকিয়া আবার ঊর্দ্ধ হইতেও মর্ত্ত্যজগতে পরিদৃশ্যমান অজ্ঞান ও দুঃখ ও পাপ ও অশুভের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা পরিচালিত করিতেছেন, প্রত্যেককে তাহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া এবং সকলকে বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক পরম জ্যোতি ও আনন্দ ও অমৃতত্ব ও পরম পদের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। এইটিই হইতেছে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সমগ্রতা। ভগবান আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে অবস্থিত, আবার সেই সঙ্গেই তিনি বিশ্বের অতীত অনন্ত সত্তা, ইহাই সেই সমগ্র জ্ঞান। পরাৎপর তিনি, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির, তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তার কার্য্যকরী শক্তির দ্বারা তিনি সর্ব্বমিদং হইয়াছেন, তাঁহার লোকাতীত পরম পদ হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে অবস্থিত, বিশ্বের সকল ঘটনা পরম্পরার কারণ, নিয়ন্তা, পরিচালক, অথচ তিনি এত উচ্চ, মহান্ ও অনন্ত যে তাঁহার কোনো সৃষ্টিই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না।

এই জ্ঞানের স্বরূপ তিনটি পৃথক আশ্বাসপূর্ণ শ্লোকে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। ভগবান বলিলেন,* "যে আমায় অজ, অনাদি ও সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বররূপে জানে, সে মর্ত্ত্যলোকে মোহশূন্য হইয়া বাস করে এবং সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে আমার এই বিভূতি, এই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরত্ব এবং আমার এই যোগ (ঐশ্বর যোগ, যাহার দ্বারা বিশ্বাতীত ভগবান সকল সৃষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াও সকলের সহিত এক, সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং সকলকে স্বীয় প্রকৃতির পরিণামরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন) যথার্থরূপে জানে সে অবিকম্পিত যোগে আমার সহিত যুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সকলের উৎপত্তি-স্থল, আমা হইতেই সকলের কর্ম্ম ও গতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া জ্ঞানীগণ আমার ভজনা করেন...এবং আমি তাহাদিগকে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন এবং আমি তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিই।" ঐ জ্ঞানের স্বরূপ হইতেই, এবং যে যোগসাধনার দ্বারা ঐ জ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশ,

---

* এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০।৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ ॥ ১০।৮
তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০।১১

অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে পরিণত হয় সেই যোগের স্বরূপ হইতেই এই সকল ফল অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ মানুষের মনের ও কর্ম্মের সকল ভ্রান্তি, তাহার মন, ইচ্ছা, নৈতিক প্রবৃত্তির, তাহার হৃদয়ের, ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের প্রেরণার যত স্খলন, অনিশ্চয়তা ও সন্তাপ, সমুদয়েরই মূল হইতেছে তাহার সম্মোহ; এই সম্মোহ, এই তমসাচ্ছন্ন ও ভ্রান্তিময় জ্ঞান ও কর্ম্মই মর দেহে অবস্থিত ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিমূঢ় মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সে সকল বস্তুর দিব্য উৎসটিকে দেখিতে পায়, যখন সে বিশ্বের দৃশ্যমান রূপ হইতে বিশ্বাতীত সদ্বস্তুর দিকে অবিচলিত ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, এবং সেই সদ্বস্তু হইতে আবার এই দৃশ্যমান রূপে ফিরিয়া আসে, তখন সে মন, ইচ্ছা, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের এই সম্মোহ হইতে মুক্তিলাভ করে, জ্ঞানদীপ্ত ও মুক্ত হইয়া বিচরণ করে, অসংমূঢ় মর্ত্ত্যেষু। প্রত্যেক জিনিষকে তাহার পরম ও যথার্থ স্বরূপে সে দেখে, আর শুধুই তাহার বর্ত্তমান ও আপাতদৃশ্য রূপে নহে; এইভাবে সে প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র ও সম্বন্ধসকল দেখিতে পায়, সে সজ্ঞানে সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করে, তাহাদের মহান্ ও সত্য লক্ষ্য অনুসারে কর্ম্ম করে এবং নিজের অন্তরস্থিত ভগবান হইতে যে শক্তি ও জ্যোতি তাহার নিকট আসে তাহার দ্বারাই সে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবেই সে ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে, মন ও ইচ্ছার ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া হইতে, ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ইন্দ্রিয়প্রেরণা হইতে মুক্ত হয়, আর এই সবই হইতেছে এখানকার সকল পাপ, ভ্রান্তি ও দুঃখের মূল, সর্ব্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। কারণ এইভাবে বিশ্বাতীত ও বিশ্বব্যাপী সত্তার মধ্যে বাস করিয়া সে নিজের ও আর সকলের ব্যষ্টিগত সত্তাকে তাহাদের মহত্তর স্বরূপে

দেখিতে পায়, এবং তাহার ভেদাত্মক ও অহমাত্মক ইচ্ছা ও জ্ঞানের মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হয়। এইটিই হইতেছে অধ্যাত্ম মুক্তির সার তত্ত্ব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতার মতে মুক্ত পুরুষের যে জ্ঞান তাহা জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সকল সম্বন্ধ-শূন্য নৈর্ব্যক্তিকতার চৈতন্য নহে, একটা কিছু-না-করা শান্ত অবস্থা নহে। কারণ মুক্ত পুরুষের মন ও আত্মায় সকল সময়েই এই বোধ, এই সমগ্র অনুভূতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, বিশ্বের ঈশ্বর ভগবান সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া সব কিছুকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিতেছেন, এতাং বিভূতিং মম যো বেত্তি।* তিনি জানেন যে তাঁহার আত্মা বিশ্ব-জগতের অতীত সত্তা, কিন্তু তিনি ইহাও জানেন যে, ঐশ্বরিক যোগের দ্বারা তিনি এই বিশ্বের সহিত এক, যোগম্ চ মম। এবং তিনি বিশ্বাতীত সত্তা, বিশ্ব-সত্তা ও ব্যষ্টি-সত্তা প্রত্যেকটি দিক পরম সত্যের সহিত যথার্থ সম্বন্ধে দেখেন এবং সবকে ঐশ্বরিক যোগের ঐক্যের মধ্যে যথাক্রমে সন্নিবেশিত করেন। তিনি আর জিনিষসকলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখেন না,—এইরূপ পার্থক্যে দেখিলে কোনো জিনিষেরই সুব্যাখ্যা হয় না অথবা শুধু একটা দিকই দেখা হয়। আবার তিনি যে সকল জিনিষকে গোলমালে একাকার করিয়া দেখেন তাহাও নহে,—এরূপ গোলমাল করিয়া দেখার ফল হইতেছে ভ্রান্ত দৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল কর্ম্ম। তিনি বিশ্বাতীত সত্তায়

* এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০।৭

নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর তিনি বিশ্বের দ্বন্দ্বে এবং কাল ও ঘটনাচক্রের গণ্ডগোলে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হন না। এই সকল সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যেও তিনি অবিচলিত, তাঁহার আত্মা বিশ্বমাঝে শাশ্বত ও অধ্যাত্মের সহিত অটল অচল নিষ্কম্প যোগে নিবিষ্ট। এই সবের ভিতর দিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, যোগেশ্বরের দিব্য সঙ্কল্পই অব্যর্থভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, এবং তিনি শান্ত বিশ্বব্যাপকত্ব ও সকল বস্তু, সকল প্রাণীর সহিত একত্বের বোধ লইয়া কর্ম্ম করেন। আর এই যে সকল বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, ইহার অর্থ নহে যে, তাঁহার আত্মা ও মন ভেদাত্মক নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ; কারণ তাঁহার অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তি নীচের প্রাতিভাসিক রূপ ও ক্রিয়া নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে আভ্যন্তরীন সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং পরম বিশ্বাতীত সত্তা। তিনি তাঁহার প্রকৃতিতে ও সত্তার ধর্ম্মে ভগবানেরই সদৃশ হন, সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, আত্মার বিশ্বব্যাপকত্বের মধ্যেও তিনি বিশ্বাতীত, মন প্রাণ দেহের ব্যষ্টিত্বের মধ্যেও তিনি বিশ্বব্যাপী। এই যোগ একবার সিদ্ধ, অটল, সুদৃঢ় হইলে, তিনি প্রকৃতির যে কোনো ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, যে কোনো মানবীয় অবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, যে কোনো বিশ্ব-কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহাতে আর তিনি ভগবদ্ আত্মার সহিত ঐক্য হইতে কিছুমাত্র স্খলিত হন না, সর্ব্বভূতমহেশ্বরের সহিত তাহার নিত্য মিলন বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।

ভাব ও হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান সেই ভগবানের প্রতি শান্ত প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিণত হয় যিনি আমাদের উর্দ্ধে বিশ্বাতীত আদিদেব, আর এখানে সকল বস্তুর অধীশ্বর, মানুষের মধ্যে ভগবান,

প্রকৃতির মধ্যে ভগবান। প্রথম প্রথম ইহা হয় শুধু বুদ্ধির একটা জ্ঞান, কিন্তু ইহার সহিত যুক্ত হয় হৃদয়ের আবেগময় অধ্যাত্মভাব, বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ। হৃদয় ও মনের এই যে পরিবর্ত্তন, ইহাই সমগ্র প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তরের সূচনা। এক নূতন আভ্যন্তরীন জন্ম ও বিকাশ আমাদিগকে আমাদের প্রেম ও ভক্তির পরম পাত্রের সহিত একত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, মদ্‌ভাবায়। এই যে-ভগবান তখন জগতের সর্ব্বত্র এবং ইহার ঊর্দ্ধে দৃষ্ট হন, তাঁহার মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতায় প্রগাঢ় প্রেমানন্দ, প্রীতি, অনুভূত হয়। মন যে জগতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বাহ্য সুখের সন্ধান করিতেছে, এই গভীরতর আনন্দোল্লাস তাহার স্থান গ্রহণ করে, অথবা বলিতে পারা যায় যে, উহা আর সকল আনন্দকে নিজের মধ্যেই টানিয়া লয় এবং এক অত্যাশ্চর্য্য রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা মনের ও হৃদয়ের অনুভবসকলকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। সমগ্র চিত্ত ভগবদ্‌ময় হইয়া উঠে এবং ভগবদ্‌ চৈতন্যের সাড়ায় ভরিয়া উঠে; সমগ্র জীবন আনন্দানুভূতির এক সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এইরূপ ভগবদ্‌ প্রেমিকগণের সকল বাক্য ও চিন্তা হয় পরস্পরের সহিত ভগবদ্‌ বিষয়ে আলাপন, ভগবদ্‌তত্ত্ব অনুধাবন। সেই একই আনন্দে সত্তার সকল তৃপ্তি, প্রকৃতির সকল লীলা, সকল সুখ কেন্দ্রীভূত হয়। চিন্তায় ও স্মৃতিতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিত্য মিলন হয়, আত্মায় একত্বের অনুভূতি কখনও কোনক্রমে ছিন্ন হয় না। আর যে মুহূর্ত্তে এই আভ্যন্তরীন অবস্থা আরম্ভ হয়, ইহা যখন অপূর্ণ রহিয়াছে তখনও ভগবান পূর্ণ বুদ্ধিযোগের দ্বারা ইহাকে দৃঢ় করিয়া দেন। তিনি আমাদের মধ্যে ভাস্বর জ্ঞানের দীপ প্রজ্জ্বলিত

করিয়া তোলেন, ভেদাত্মক মন ও বুদ্ধির অজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া দেন, মানবাত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তিনি দণ্ডায়মান হন।* কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রদীপ্ত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাদের নীচের বিক্ষুব্ধ মানসিক স্তর হইতে সক্রিয় প্রকৃতিব উর্দ্ধে সাক্ষী আত্ম-পুরুষের অক্ষর শান্তির মধ্যে উন্নয়ন সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই যে মহত্তর বুদ্ধিযোগ সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানের সহিত প্রেম ও ভক্তির প্রদীপ্ত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার দ্বারা এখন মানবাত্মা এক বিশাল আনন্দে সর্ব্বউদ্ভবকর্ত্তা পরমেশ্বরের সমগ্র লোকাতীত সত্যের মধ্যে উঠিয়া যায়। ব্যষ্টিগত আত্মা ও ব্যষ্টিগত প্রকৃতির মধ্যে শাশ্বতের প্রকাশ পূর্ণ হয়; ব্যষ্টিগত আত্মা কালাধীন জন্ম হইতে শাশ্বতের অনন্তত্বের মধ্যে উর্দ্ধগতি লাভ করে।

---

* মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।৯-১১

বিভূতিরূপে ভগবান

এখন একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থানে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে, অধ্যাত্মমুক্তি এবং দিব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে গীতা যে শিক্ষা পরিস্ফুট করিতেছিল তাহার সহিত গীতার দার্শনিক তত্ত্বগত সমন্বয়ের বিবৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুনের বুদ্ধিতে ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন; মনের অনুসন্ধান ও হৃদয়ের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাকে পরম ও বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে, পরম ও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপে, আমাদের জীবনের অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে গোচর করান হইয়াছে; মানুষের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি তাঁহাকেই অজ্ঞান কুহেলিকার ভিতর দিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল। এখন কেবল বাকী রহিয়াছে বহুলরূপী বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ, তাহা হইলেই দিব্য প্রকাশনটির নানা দিকের আর একটি দিক পূর্ণ হইবে।

তাত্ত্বিক সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে। আত্মাকে নীচের প্রকৃতি হইতে পৃথক করিবার জন্য সাংখ্যকে স্বীকার করা হইয়াছে, এই পার্থক্য সাধন করিতে হইবে বিবেকবুদ্ধির ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ গুণত্রয়ের বশ্যতা হইতে উপরে উঠিয়া। পরম পুরুষ ও পরাপ্রকৃতির ঐক্য উদারভাবে প্রকট করিয়া সাংখ্যকে সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং তাহার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করা হইয়াছে। অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রাকৃত ভেদাত্মক ব্যক্তিরূপ গড়িয়া উঠে তাহার

আত্মবিলোপ সাধনের জন্য দার্শনিকদের বেদান্তকে স্বীকার করা হইয়াছে। উদার নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকতার নিরসন করিতে, ব্রহ্মের ঐক্যে ভেদাত্মক ভ্রান্তির ধ্বংস করিতে এবং অহংয়ের অন্ধ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে সর্ব্বভূতকে এক আত্মায় এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখিবার সত্যতর দৃষ্টি লাভ করিতে বেদান্তের প্রণালী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বেদান্তের প্রণালীকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পরব্রহ্মকে নিরপেক্ষভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তাহা হইতে সচল ও অচল, ক্ষর ও অক্ষর, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়ই উদ্ভূত। ইহার মধ্যে যে-সকল সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়া সম্ভব সে-সব অতিক্রম করিতে পরমাত্মা ও ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তিনিই সমস্ত প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইতেছেন, সকল ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সকল কর্ম্মেই তাঁহার প্রকৃতির শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ইচ্ছাশক্তি, মন ও হৃদয়কে, সমগ্র আভ্যন্তরীণ সত্তাকে ঈশ্বরের নিকট, প্রকৃতির দিব্য অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিবার জন্য যোগকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে বিশ্বের পরম অধীশ্বরকে আদিদেব বলিয়া প্রকট করা হইয়াছে, জীব প্রকৃতিতে তাঁহারই আংশিক সত্তা, মমৈবাংশ। এক অখণ্ড অধ্যাত্ম ঐক্যের জ্যোতিতে সকল বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া অন্তরাত্মার যে-দৃষ্টি তাহার দ্বারা এই যোগের সকল সম্ভাব্য সঙ্কীর্ণতা অতিক্রমিত হইয়াছে।

ফলে হইয়াছে ভগবদ্-সত্তা সম্বন্ধে এক অখণ্ড দৃষ্টি, তাহা একই সঙ্গে বিশ্বের বিশ্বাতীত উৎপত্তিস্থল স্বরূপ পরম সত্তা, বিশ্বের শান্ত আধার স্বরূপ সর্ব্বভূতের নিরুপাধিক আত্মা, আবার সকল জীবে, ব্যক্তিতে, শক্তিতে, গুণে অনুস্যূত ভগবান; সেই অনুস্যূত ভগবদ্ সত্তাই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা,

কার্য্যকরী প্রকৃতি এবং আন্তর ও বাহ্য প্রকাশধারা। এক অদ্বিতীয়কে এইরূপ অখণ্ডভাবে দেখিয়া ও জানিয়াই জ্ঞানযোগ তাহার পরম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কর্ম্মযোগ তাহার পূর্ণতম পরিণতি লাভ করিয়াছে সকল কর্ম্মকে তাহাদের অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিয়া, কারণ প্রাকৃত যে মানব সে এখন কেবল তাঁহার ইচ্ছার একটি যন্ত্রমাত্র, নিমিত্ত মাত্র ; ভক্তিযোগের প্রশস্ততম রূপগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের যে প্রগাঢ় সমন্বয়, প্রেম তাহাকে আত্মার সহিত পরমাত্মার ঊর্দ্ধতম, উদারতম, সমৃদ্ধতম মিলনের মধ্যে লইয়া গিয়া পূর্ণ পরিণতি প্রদান করে। সেই মিলনে জ্ঞানের প্রকাশসকল যেমন বুদ্ধির নিকটে তেমনিই হৃদয়ের নিকটেও সত্য হইয়া উঠে। সেই মিলনে যন্ত্ররূপে কর্ম্মকরার দুষ্কর আত্মবলি এক জীবন্ত ঐক্যের সহজ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। অধ্যাত্ম মুক্তির সমগ্র পন্থাটি দেওয়া হইয়াছে ; দিব্য কর্ম্মের সমগ্র ভিত্তিটি রচিত হইয়াছে।

দিব্যগুরু এইরূপে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জুনকে দিলেন, অর্জ্জুন তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহার মন ইতিমধ্যেই সংশয় ও অন্বেষণ হইতে মুক্ত হইয়াছে ; তাঁহার হৃদয় এখন জগতের বাহ্যদিক হইতে, ইহার বিভ্রান্তকারী বাহ্যদৃশ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহার পরম অর্থ ও উৎপত্তির দিকে, ইহার আভ্যন্তরীণ সত্যসকলের দিকে ফিরিয়াছে, ইতিমধ্যেই শোক ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে, এবং এক দিব্য দৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। অর্জ্জুন যে ভাষায় তাঁহার স্বীকৃতি ব্যক্ত করিলেন তাহাতে পুনরায় এই জ্ঞানের সুগভীর সমগ্রতা এবং ইহার সর্ব্বতোমুখী শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যে অবতার, নর-রূপী

ভগবান, তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, প্রথমতঃ, তাঁহাকে তিনি পরম ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, তিনি বিশ্বাতীত সর্ব্বাত্মক সত্তা, পরাৎপর, জীব যখন এই ব্যক্তজগৎ ও এই আংশিক প্রকাশ হইতে উঠিয়া তাহার মূলে ফিরিয়া যায় তখন সে তাঁহার মধ্যে বাস করে, পরং ধাম*। তাঁহাকে তাঁহার চিরমুক্ত সত্তার পরম পবিত্রতায় তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন, পবিত্রম্ পরমম্; অক্ষর আত্মার চিরশান্ত ও স্থির নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে অহংকে লুপ্ত করিয়া দিয়া মানুষ এই পরম পবিত্রতায় উপনীত হয়। তাহার পর তিনি তাঁহাকে শাশ্বত সনাতন দিব্য পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যং। তাঁহার মধ্যেই তিনি আদিদেবকে অভিবাদন করিলেন, যে অজাত পুরুষ সকল বিশ্বের সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী আত্ম-প্রসারী প্রভু তাঁহার স্তব করিলেন, আদিদেবমজং বিভুম্। যিনি সকল বর্ণনার অতীত, কারণ কিছুই তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ,† কি দেব, কি দানব কেহই তাঁহার অভিব্যক্তি জানে না, সেই আশ্চর্য্যময় পুরুষরূপেই যে তিনি তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইলেন শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তিনি তাঁহাকে সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং তাহাদের সকল রূপায়নের এক দিব্য কারণ বলিয়াও মানিয়া লইলেন,

---

* পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২

† সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ॥ ১০।১৪

তিনি দেবতাদেরও দেবতা, তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি, তিনি জগতের পতি, ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার পরম ও বিশ্বগত প্রকৃতির দ্বারা ইহাকে প্রকট করিতেছেন, পরিপালনও করিতেছেন, ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে*। অবশেষে তিনি তাঁহাকে আমাদের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত সেই বাসুদেব বলিয়া মানিয়া লইলেন যিনি তাঁহার বিশ্বব্যাপী সর্ব্বত্র-বিরাজিত সর্ব্ব-সংগঠনকারী বিভূতিসকলকে আশ্রয় করিয়া ইহ-সংসারের সকল বস্তু হইয়াছেন †।

এই সত্যকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি দিয়া, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির আনুগত্য দিয়া, তাঁহার বুদ্ধির ধারণা দিয়া। এই জ্ঞানে এবং এই আত্মসমর্পণের সহিত ভগবানের যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করিতে তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু এক স্থায়ী গভীরতর অধ্যাত্ম অনুভূতির জন্য তাঁহার হৃদয়ে ও ইচ্ছায় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই যে সত্য ইহা কেবল পরমাত্মার কাছে তাঁহার নিজের আত্মজ্ঞানেই প্রকট—কারণ অর্জ্জুন বলিয়া উঠিলেন "কেবল তুমি, হে পুরুষোত্তম, নিজেকে দিয়া নিজেকে জান" স্বয়মেবাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। এই যে জ্ঞান ইহা আসে আধ্যাত্মিক ঐক্যোপলব্ধির দ্বারা এবং প্রাকৃত মানবের হৃদয় ইচ্ছা বুদ্ধি বিনা সহায়ে নিজেদের ক্রিয়া দ্বারা ইহা লাভ করিতে সক্ষম হয় না, কেবল অসম্পূর্ণ মানসিক প্রতিচ্ছায়া পাইতে পারে, তাহাতে

---

* স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১০।১৫

† বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১০।১৬

যত প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা আবরিত ও বিকৃত হয় অধিক। এই গুহ্য বিদ্যা শুনিতে হয় সেই সব ঋষির নিকট হইতে যাঁহারা সাক্ষাৎ সত্যকে দেখিয়াছেন, ইহার বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন এবং সত্তায় ও আত্মায় ইহার সহিত এক হইয়াছেন। "সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ অসিত দেবল ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন"*। অথবা যে অন্তর্যামী ভগবান আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের জ্বলন্ত দীপ তুলিয়া ধরেন তাঁহার নিকট হইতে দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি সহায়ে এই সত্যকে অন্তরের মধ্যেই লাভ করিতে হয়। স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে, "এবং তুমি স্বয়ংই আমাকে এইরূপ বলিতেছ।" একবার এই সত্য প্রকটিত হইলে, মনের সম্মতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি এবং হৃদয়ের আনন্দ ও আনুগত্যসহ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে; পরিপূর্ণ মানসিক শ্রদ্ধা এই তিনটিকে লইয়াই গঠিত। অর্জ্জুন ঠিক এইভাবেই সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছেন; সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব, "হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা যাহা কহিলে আমার মন সে-সমস্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে।" কিন্তু ইহা ছাড়াও প্রয়োজন আমাদের নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তায় এই সত্যকে আয়ত্ত করা; আমাদের অন্তরতম অন্তরাত্মা চায় অলঙ্ঘনীয় অনির্ব্বচনীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধি—মানসিক অনুভূতি তাহার কেবল উপক্রমণিকা বা ছায়ামাত্র, এবং সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অনন্তের সহিত পূর্ণ মিলন হওয়া সম্ভব নহে।

---

* আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলোঃ ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১০।১৩

এখন সেই উপলব্ধি কেমন করিয়া লাভ করা যায় অর্জ্জুনকে সেই পন্থাই দেওয়া হইতেছে। মহান স্বতঃসিদ্ধ যে-সব দিব্য তত্ত্ব, সে-সব মনকে বিভ্রান্ত করে না। পরম পুরুষ ভগবানের ধারণা, অক্ষর পুরুষের অনুভূতি, সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে অনুস্যূত ভগবদ্ সত্তাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, সচেতন বিশ্বপুরুষের স্পর্শ—এই সবের দিকে মন নিজেকে উন্মুক্ত করিতে পারে। একবার মন এই ধারণায় উদ্ভাসিত হইলে, মানুষ সহজেই পথটি অনুসরণ করিতে পারে এবং প্রথম প্রথম সাধারণ মানসিক অনুভূতি উপলব্ধি সকলের উপরে উঠা যতই কঠিন হউক, শেষ পর্য্যন্ত আত্মার অনুভূতিতে সেই সকল মূল সত্যে পৌছিতে পারে যাহারা আমাদের সত্তার এবং সর্ব্বভূতের সত্তার পশ্চাতে রহিয়াছে, আত্মনা আত্মানাম্। সে সহজেই ইহা পারে কারণ এই সকল জিনিষ একবার ধারণা করিতে পারিলেই স্পষ্ট সে-সবকে দিব্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; আমাদের মানসিক সংস্কারাদির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা ভগবানের এই সব উচ্চভাবকে স্বীকার করার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু কঠিন হইতেছে জগৎ বস্তুতঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহার মধ্যেই ভগবানকে দেখা, প্রকৃতির এই বাস্তব সত্যের মধ্যে এবং এই সব ঘটনাপরম্পরার ছদ্মবেশের মধ্যে তাঁহার সন্ধান পাওয়া; কারণ এখানে সবই এই মহান ঐক্যসাধক ভাবের বিরোধী। কেমন করিয়া আমরা মানিয়া লই যে ভগবান রহিয়াছেন মানুষে, পশুতে, জড়পদার্থে? উত্তমে ও অধমে? মধুরে ও ভীষণে? শুভে ও অশুভে? ভগবান বিশ্বের সকল পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ কোন ধারণা লইয়া যদি আমরা তাঁহাকে দেখি জ্ঞানের আদর্শ আলোকের মধ্যে, শক্তির মহত্ত্বের মধ্যে,

সৌন্দর্য্যের মনোহারিত্বের মধ্যে, প্রেমের কল্যাণকারিতার মধ্যে, আত্মার উদার বিশালতার মধ্যে, তাহা হইলে এই সকল মহৎ জিনিষের সহিত ইহাদের বিপরীত যে-গুলি বাস্তবে জড়িত রহিয়াছে, ইহাদিগকে ঢাকিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সেই ঐক্যবোধ বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা আমরা কেমন করিয়া নিবারণ করিব? আর যদি মানবীয় মন ও প্রকৃতির অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা ভাগবত মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পারি, তাহা হইলে যাহারা তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, আমরা ভগবদ্‌বিরোধী বলিতে যাহা বুঝি যাহারা কর্ম্মে ও স্বভাবে তাহারই প্রতিনিধি তাহাদের মধ্যে আমরা কেমন করিয়া ভগবানকে দেখিব? যদি সাধু সজ্জনের মধ্যে নারায়ণকে দেখা সহজ হয়, পাপীর মধ্যে, দুরাচারীর মধ্যে, পতিতা ও অন্ত্যজের মধ্যে তাঁহাকে দেখা কেমন করিয়া আমাদের পক্ষে সহজ হইবে? জগতের সকল ভেদ বৈষম্যের মধ্যে পরম পবিত্রতা ও ঐক্যের সন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞানীকে দৃঢ়স্বরেই বলিতে হয় নেতি, নেতি, ইহা নয়, ইহা নয়। যদিও জগতের অনেক জিনিষেই আমরা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সায় দিতে পারি এবং বিশ্বমাঝে ভগবান রহিয়াছেন স্বীকার করিতে পারি, তাহা হইলেও অধিকাংশ জিনিষের সম্মুখেই মন কি পুনঃ পুনঃ বলিবে না, "ইহা নয়, ইহা নয়?" মানব মন সর্ব্বদা বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে এখানে বুদ্ধির স্বীকৃতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি, হৃদয়ের শ্রদ্ধা অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে। অন্ততঃ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিদর্শন প্রয়োজন, কতকগুলি এমন সূত্র ও সেতু প্রয়োজন যাহা ঐক্যবোধের কঠিন প্রয়াসের সহায় হইবে।

অর্জ্জুন এইরূপ সহায় ও নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, যদিও তিনি বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এই দিব্য সত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় ইহার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে (কারণ ইতিমধ্যেই তিনি দেখিতেছেন যে এই সত্য তাঁহার মনের বৈকল্য ও ভেদবৈষম্য সকল হইতে তাহাকে মুক্ত করিতেছে, বিরোধসঙ্কুল জগতের সমস্যাসকলের দ্বারা বিভ্রান্ত তাঁহার সেই মন একটি সূত্র খুঁজিতেছিল, একটি দিশারী সত্যের সন্ধান করিতেছিল ; এবং তাঁহার শ্রবণে ইহা অমৃতের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, তৃপ্তিহি নাস্তি মেঽমৃতম্ ।) তিনি অনুভব করিতেছেন যে পূর্ণ ও সুদৃঢ় উপলব্ধির দুরূহতা দুর করিবার জন্য ঐরূপ নিদর্শন ও আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয় ; কারণ তাহা না হইলে এই জ্ঞানকে কেমন করিয়া হৃদয়ের এবং জীবনের জিনিষ করিয়া তোলা যাইবে ? তিনি সহায়ক নিদর্শন সকল জানিতে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার দিব্য বিভূতিসকল সম্পূর্ণভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে বলিলেন, প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহার দৃষ্টি হইতে কিছুই না বাদ পড়ে, আর যেন কিছুর দ্বারা তাঁহাকে বিভ্রান্ত হইতে না হয়*। তিনি বলিলেন, "তুমি যে-সকল বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ,

---

* বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥
কথং বিদ্যামহং যোগিং ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম ॥ ১০।১৬—১৮

তোমার সেই দিব্য আত্মবিভূতিসকল নিঃশেষে সমস্ত বর্ণনা কর। হে যোগিন্! আমি সদা সর্ব্বত্র তোমাকে চিন্তা করিয়া কিরূপে জানিব? হে ভগবান! কি কি প্রধান প্রধান ভাবে আমি তোমাকে চিন্তা করিব? এই যে যোগের দ্বারা তুমি সবের সহিত এক এবং সবের মধ্যে এক এবং সব তোমারই সত্তার পরিণাম, সবই তোমার প্রকৃতির ব্যাপক বা প্রকৃষ্ট বা প্রচ্ছন্ন শক্তি, সেই যোগ আমাকে বিস্তৃতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা কর, এবং বার বার বল; আমার নিকটে ইহা অমৃত স্বরূপ, আমি যতই ইহা শ্রবণ করি না কেন, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না। এখানে আমরা গীতার মধ্যে একটা জিনিষের ইঙ্গিত পাইতেছি, যেটি গীতা কোথাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু উপনিষদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে এবং পরে তাহা বৈষ্ণব ও শাক্ত-ধর্ম্মের দ্বারা গভীরতর দৃষ্টির সহিত বিকশিত হইয়াছিল—জগৎ মাঝে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাতে মানুষের আনন্দলাভের সম্ভাবনা, বিশ্বানন্দ, জগজ্জননীর লীলা, ভগবদ্ লীলার মাধুরী ও সৌন্দর্য্য।

দিব্যগুরু শিষ্যের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্ণ উত্তর সম্ভব নহে। কারণ ভগবান অনন্ত এবং তাঁহার প্রকাশও অনন্ত। তাঁহার প্রকাশের রূপসকলও অসংখ্য। প্রত্যেক রূপই নিজের মধ্যে লুক্কায়িত কোন ভগবদ্ শক্তির প্রতীক, বিভূতি এবং যাঁহাদের দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখেন প্রত্যেক সসীম বস্তুই আপন আপন ভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি তোমাকে আমার দিব্য বিভূতিসকল বর্ণনা করিব, তবে কেবল নিদর্শন হিসাবে প্রধান প্রধান বিভূতির কয়েকটি মাত্র বলিব; এমন

কতকগুলি জিনিষের দৃষ্টান্ত দিব যে-সবের মধ্যে তুমি খুব সহজেই ভগবানের শক্তি দেখিতে পাইবে, প্রাধান্যতঃ, উদ্দেশতঃ* । কারণ জগতে ভগবানের আত্মবিস্তারের অন্ত নাই, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে । এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গুরু যে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, বর্ণনার শেষেও আবার তাহার উল্লেখ করিলেন এইটির উপর বিশেষ ভাবে জোর দিবার জন্য যেন এ-সম্বন্ধে আর কোনও ভুল না হইতে পারে । তাহার পর এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আমরা পাই এই সকল প্রধান প্রধান দৃষ্টান্তের, জগতের মানুষ ও জিনিষসকলের মধ্যে যে ভগবদ্ শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার এই সব প্রকৃষ্ট লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । প্রথমে মনে হয় যেন সেগুলি এলোমেলোভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনও পারম্পর্য্য নাই ; তথাপি সেই বর্ণনায় একটি বিশেষ সূত্র অনুসরণ করা হইয়াছে, যদি আমরা একবার সেই সূত্রটিকে ধরিতে পারি তাহা হইলে এখানকার বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ ও পরিণতি বুঝার পক্ষে সাহায্য হইবে । এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে, বিভূতি যোগ, এ-যোগটি অপরিহার্য্য । ভগবান বিশ্বে যাহা কিছু হইয়াছেন, শুভ অশুভ, পূর্ণতা অপূর্ণতা, আলো আঁধার, ভগবানের সমগ্র বিভূতির সহিতই সমানভাবে আমাদিগকে ঐক্য উপলব্ধি করিতে হইবে, তথাপি সেই সঙ্গেই আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে একটা উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশের শক্তি রহিয়াছে, বস্তুসকলের মধ্যে ভগবানের

---

* হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১০।১৯

আত্মপ্রকাশের একটা ক্রমবর্দ্ধমান ধারা রহিয়াছে, একটি এমন স্তর-বিন্যাসের রহস্য রহিয়াছে যাহা আমাদিগকে নীচের ছদ্মবেশসকল হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্বপুরুষের উদার আদর্শ প্রকৃতির দিকে তুলিয়া লইয়া যায়।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আরম্ভ হইল সেই আদিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়া যাহা এই বিশ্বপ্রকাশের সকল শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। সেইটি এই যে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবান গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাকে সেখানে আবিষ্কার করা যায়; তিনি সকল জীব, সকল বস্তুর মন ও হৃদয়-গুহায় বাস করিতেছেন, তিনি তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনধারার মর্ম্মস্থলে অন্তরাত্মা, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে বা হইবে তিনি সে-সবেরই আদি, মধ্য এবং অন্ত*। কারণ এই যে আভ্যন্তরীণ দিব্য আত্মা মন ও হৃদয়ের মধ্যে ইহাদের অগোচরে বাস করিতেছেন, এই যে জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্যামী তাহারই প্রতিনিধিরূপে প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার অগোচর, ইনিই নিরন্তর কালের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনের বিকাশ করিতেছেন, এবং দেশের মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক জীবনের বিকাশ করিতেছেন, —কাল ও দেশ আমাদের মধ্যে ভগবানেরই ভাবাত্মক গতি ও বিস্তার। সবই এই আত্মদর্শী আত্মা, আত্মবিকাশশীল অধ্যাত্ম সত্তা। কারণ সর্ব্বদা সকল জীবের মধ্য হইতে, সকল চেতন ও অচেতন সত্তার মধ্য হইতে, এই

---

* অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০

অনুভূতিতে প্রতীয়মান হন। আবার দেশরূপে তিনিই সকল দিক হইতে আমাদের সম্মুখীন হন, লক্ষ লক্ষ তাঁহার শরীর, অসংখ্য তাঁহার মন, সর্ব্বভূতে তিনি প্রকাশমান ; আমরা আমাদের সকল দিকে তাঁহার মুখ দেখিতে পাই, ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ। কারণ এই যে কোটি কোটি জীব ও বস্তু, সকলের মধ্যে, সর্ব্বভূতেষু, একই সঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে তাঁহার আত্মা, চিন্তা ও শক্তির রহস্য, তাঁহার দিব্য সৃজন-প্রতিভা, তাঁহার আশ্চর্য্যময় গঠন-নৈপুণ্য এবং সম্বন্ধ, সম্ভাবনা এবং অনিবার্য্য কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দ্ধারণের অভ্রান্ত নীতি। আবার তিনি জগতে সর্ব্বসংহারকর্ত্তা মৃত্যুরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, মনে হয় তিনি যেন সৃষ্টি করিতেছেন শুধু শেষকালে তাঁহার সৃষ্টিসকলকে ধ্বংস করিবার জন্যই, অহম্ মৃত্যুঃ সর্ব্বহরঃ। অথচ তাঁহার লীলাশক্তির কার্য্য বন্ধ হয় না, কারণ পুনর্জন্ম এবং নবসৃষ্টির শক্তি মৃত্যু ও ধ্বংসের সহিত সমান গতিতে চলিয়াছে, অহম্ উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্। সর্ব্বভূতের অন্তর্নিহিত যে দিব্য আত্মা তাহাই বর্ত্তমানকে ধরিয়া রহিয়াছে, অতীতকে সংহরণ করিতেছে, ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করিতেছে।

তাহার পর এই যে সব সজীব সত্তা, বিশ্বদেবতা, অতিমানব, মানব, মানবেতর প্রাণী, ইহাদের মধ্যে এবং সকল গুণ, শক্তি, বস্তুর মধ্যে—প্রত্যেক শ্রেণীর যাহা প্রধান, শীর্ষস্বরূপ, গুণে সর্ব্বোত্তম, তাহাই ভগবানের একটি বিশিষ্ট শক্তি, বিভূতি। ভগবান বলিলেন, আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রগণের মধ্যে শিব, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে রণদেবতা স্কন্দ, মরুদগণের মধ্যে মরীচি, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে ধনপতি

কুবের, নাগগণের মধ্যে অনন্ত নাগ, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, জনয়িতাদের মধ্যে প্রেমের দেবতা কন্দর্প, জলদেবতাগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, নিয়মস্থাপয়িতাগণের মধ্যে নিয়মের দেবতা যম, বায়ুগণের মধ্যে পবনদেবতা। আবার অন্যদিকে আমি জ্যোতি ও দীপ্তিগণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, নিশার নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, তরঙ্গায়িত জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর, শিখরগণের মধ্যে সুমেরু, পর্ব্বতমালা সমূহের মধ্যে হিমালয়, নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, অস্ত্র সমূহের মধ্যে দিব্যাস্ত্র বজ্র। সকল লতা বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, অশ্বগণের মধ্যে ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড়, সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকী, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, অরণ্যের পশুগণের মধ্যে সিংহ। আমি বৎসরের প্রথম মাস মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) ; ঋতুসমূহের মধ্যে আমি সুন্দরতম বসন্ত ঋতু।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, সজীব সত্তাসকলের মধ্যে আমি সেই চৈতন্য যাহার দ্বারা তাহারা নিজেদিগকে এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহকে অবগত হয়। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, মনের দ্বারাই তাহারা বস্তুসকলের জ্ঞান লাভ করে এবং তাহাদের উপর প্রতিক্রিয়া করে। তাহাদের মনের, চরিত্রের, শরীরের, কর্ম্মের সকল গুণই আমি। আমি কীর্ত্তি, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ; তেজস্বিগণের তেজ আমি, বলবানগণের বল আমি। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় ও জয় ; আমি পুণ্যবানগণের সত্ত্ব গুণ, চতুরগণের দ্যূত ছল ; আমি শাসকদের শাসন দণ্ড, জিগীষুদের নীতি। আমি গুহ্যবিষয়ের মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান, তার্কিকের

তর্কবুদ্ধি। অক্ষর-সমূহের মধ্যে আমি অ-কার, সমাস-সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বাক্য-সমূহের মধ্যে পূত একাক্ষর ওঁ-কার, ছন্দ-সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, বেদ-সমূহের মধ্যে সামবেদ, এবং মন্ত্র-সমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম। আমি গণকদের কাছে কাল। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। মানুষের যাবতীয় সামর্থ্য আমি, বিশ্বের এবং বিশ্বের অন্তর্গত জীবসকলের যাবতীয় শক্তি আমি।

যাহাদের মধ্যে আমার শক্তিসকল মানবীয় সিদ্ধির উচ্চতম সীমায় উঠে, তাহারা সর্ব্বদা আমিই, আমার বিশেষ বিভূতি। আমি নরগণের মধ্যে নরাধিপ, নেতা, বীর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যোদ্ধাগণের মধ্যে আমি রাম, বৃষ্ণিগণের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি আমার বিভূতি; মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। মহান দ্রষ্টা, অনুপ্রাণিত কবি, যিনি ভাবের আলোকে এবং বাক্যের ধ্বনিতে সত্যকে দেখেন এবং প্রকট করেন, তিনিও আমি, মানবাধারে আমারই জ্যোতি; দ্রষ্টা-কবিগণের মধ্যে আমি উশনা। মুনি, মনীষী, দার্শনিকও মানুষের মধ্যে আমারই শক্তি, আমারই বৃহৎ মনীষা, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস। কিন্তু প্রকাশ-ক্রমের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, সকল জিনিষই আপন আপন ভাবে ও প্রকৃতিতে ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তি; আমা ব্যতীত জগতে স্থাবর জঙ্গম, সজীব নির্জ্জীব, কিছুই থাকিতে পারে না। সর্ব্বভূতের আমি দিব্য বীজ, এবং সকলে সেই বীজেরই শাখা ও পুষ্প, আত্মায় বীজরূপে যাহা আছে, তাহাই তাহারা প্রকৃতিতে বিকাশ করিতে পারে। আমার দিব্য বিভূতিসকলের সীমা সংখ্যা নাই; আমি যাহা বলিলাম ইহা কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আমি কেবল কতকগুলি প্রধান

প্রধান ইঙ্গিতের আলোক দিয়াছি, এবং দৃঢ়ভাবে অসংখ্য সত্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি। জগতে সুন্দর ও শ্রীমান যত জীব দেখিবে, মানবজাতির মধ্যে, তাহার উর্দ্ধে এবং তাহার নীচে যাহাকেই দেখিবে মহান এবং শক্তিমান তাহাকে আমার প্রভা, জ্যোতি, শক্তি বলিয়া এবং আমারই তেজের অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। কিন্তু এই জ্ঞানের অত খুঁটিনাটি জানিবার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমি এই জগতে এবং সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছি, আমি সকলের মধ্যে আছি এবং সকলের উপাদান; আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমাকে ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি এই সমগ্র বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছি আমার অসীম শক্তির একটি মাত্রার দ্বারা, আমার অমেয় অধ্যাত্ম সত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দ্বারা। এই সকল জগৎ শাশ্বত অপরিমেয় ভগবানের স্ফুলিঙ্গ, ইঙ্গিত, স্ফুরণ মাত্র।

বিভূতি তত্ত্ব

গীতার দশম অধ্যায়টি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ মনে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। যে মতবাদ সংসারের জীবন হইতে চরম মুক্তি চায়, মানব আত্মাকে সংসার-লীলা হইতে বিমুখ করিয়া বিশ্বের অতীত, সকল সম্বন্ধের অতীত সুদূর নিরুপাধিক সত্তার দিকে লইতে চায়, গীতার মধ্যে কেবল সেই মতবাদের সমর্থন খুঁজিতে গেলে এই দশম অধ্যায়ের প্রকৃত মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝা যায় না। মানুষের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন—এই মহান সত্যই গীতার বাণী। তিনি ক্রমবর্দ্ধমান যোগশক্তির বলে নীচের প্রকৃতির মায়া আবরণ সরাইয়া নিজেকে প্রকাশিত করেন, মানবাত্মার সকাশে নিজের বিশ্ব-সত্তা প্রকট করেন, তাঁহার বিশ্বাতীত পরম ঐশ্বর্য্যসকল প্রকট করেন, মানুষের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যেই যে তিনি রহিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দেন। এই যে দিব্যযোগ, মানুষের ভাগবত সত্তায় গড়িয়া উঠা, মানবাত্মার মধ্যে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ভগবানের আত্মপ্রকাশ, ইহারই ফলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া এক দিব্য মানবতার ঊর্দ্ধতন প্রকৃতিতে উঠিতে সক্ষম হই। মর্ত্ত্যজীবনের জালে, গুণত্রয়ের জটিল বন্ধনে নহে, পরন্তু সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মে ভগবানের সহিত এক হইয়া এবং নিজের সমস্ত সত্তাকে ভগবানে

অর্পণ করিয়া মানুষ চরমতম বিশ্বাতীত গতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু আবার সংসারের মধ্যেও কর্ম্ম করিতে পারে; সে কর্ম্ম তখন আর অজ্ঞানের কর্ম্ম থাকে না, ভগবানের সহিত ব্যষ্টিগত জীবের সত্য সম্বন্ধে, আত্মার সত্যতে, পূর্ণ অমৃতত্বে সে কর্ম্ম করা হয়; সে কর্ম্ম অহংয়ের জন্য সম্পাদিত হয় না, পরন্তু জগতে ভগবানের জন্যই সম্পাদিত হয়। অর্জ্জুনকে এই কর্ম্মের জন্য আহ্বান করা, সে নিজে কি সত্তা ও শক্তি এবং তাহার ভিতর দিয়া কোন্ মহান সত্তা ও শক্তির ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া, ইহাই মানবদেহধারী ভগবানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই ভগবান কৃষ্ণ তাহার রথের সারথি হইয়াছেন; এই জন্যই অর্জ্জুনের গভীর বিষাদ আসিয়াছিল, মানুষ সাধারণতঃ যে সব ক্ষুদ্র বাসনা ও আদর্শ লইয়া কার্য্য করে সে সবের প্রতি তাহার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; সে-সবের পরিবর্ত্তে তাহাকে উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রেরণা দিবার জন্য ভগবান কুরুক্ষেত্রে, অর্জ্জুনের ভগবদ্ নির্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের পরম মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য এবং যুদ্ধ করিতে ভগবদ্ আদেশ শুনাইবার জন্য এতক্ষণ তাহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখন সেই সময় আসন্ন; কিন্তু এই অধ্যায়ে বিভূতি-যোগের ভিতর দিয়া তাহাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইবে, ইহা না হইলে অর্জ্জুন তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না।

বিশ্ব-লীলার যে নিগূঢ়-রহস্য, গীতাতে তাহা আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আংশিকভাবে, কারণ সে রহস্যের অনন্ত গভীরতাসকল কে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে? কোন্ মতবাদ, কোন্ দর্শন-শাস্ত্র

বলিতে পারে যে, এই অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব-লীলার সমস্ত রহস্য অল্প-পরিসরের মধ্যেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে কিম্বা একটা সঙ্কীর্ণ মতবাদের মধ্যেই নিঃশেষে ধরিয়া দিয়াছে? কিন্তু গীতার যাহা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, গীতা তাহা প্রকাশ করিয়াছে। গীতাতে আমরা দেখিতে পাই, জগৎ কেমন করিয়া ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান জগতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, জগৎ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে; সর্ব্বভূত সকল সৃষ্টি মূলতঃ এক। আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির অজ্ঞানে আবদ্ধ মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি, মানুষ কেমন করিয়া আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়, এক মহত্তর চৈতন্যে নব-জন্ম লাভ করে, নিজেরই উচ্চতর অধ্যাত্ম-সত্তায় উঠিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন প্রথমকার অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া এই নূতন আত্মদৃষ্টি ও চেতনা লাভ করা যায়, তখন সেই মুক্ত-পুরুষ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত জগৎকে কি চক্ষে দেখিবে? যে বিশ্ব-লীলার মূল রহস্যটি সে পাইয়াছে, সেই বিশ্ব-লীলার প্রতি তাহার ভাব, তাহার আচরণ কিরূপ হইবে? প্রথমেই সে সর্ব্বভূতের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিবে এবং সেই জ্ঞানের চক্ষুতেই সব কিছুকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, তাহার চারিপাশে যাহা কিছু রহিয়াছে সে সব একই ভাগবত সত্তার আত্মা, রূপ, শক্তি। তখন হইতে সেই দৃষ্টিই হইবে তাহার চেতনার সমস্ত অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রচেষ্টার আরম্ভ; ইহাই হইবে তাহার সকল কর্ম্মের মূল দৃষ্টি, অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা। সে দেখিবে সমস্ত বস্তু, সমস্ত জীব সেই একের মধ্যেই বাস করিতেছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে, সেই দিব্য ও ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। কিন্তু সে আরও দেখিবে যে,

সেই এক সকলের মধ্যেই অধিবাসী, সকলের আত্মা, সকলের মধ্যেই মূল অধ্যাত্ম সত্তা; তিনি তাহাদের চেতন প্রকৃতিতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান না থাকিলে তাহারা আদৌ বাঁচিতে পারিত না, চলিতে, ফিরিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিত না, তাঁহার ইচ্ছা, শক্তি, অনুমতি বা প্রশ্রয় ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের বিন্দুমাত্র নড়া চড়া সম্ভব হইত না। সে দেখিবে যে, তাহারা নিজেরাও, তাহাদের আত্মা, মন, প্রাণ, শরীরাধার এ-সব সেই এক আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তারই শক্তি ও ইচ্ছার পরিণাম। তাহার কাছে সমস্তই হইবে সেই এক বিশ্বপুরুষের আত্মপ্রকাশ লীলা। সে দেখিবে যে, তাহাদের চেতনা সমগ্রভাবেই সেই বিশ্বপুরুষের চেতনা হইতে সমুদ্ভূত, তাহাদের শক্তি ও সঙ্কল্প সেই পুরুষেরই শক্তি ও সঙ্কল্প হইতে আহৃত এবং তাঁহারই আশ্রিত; তাহাদের আংশিক প্রকৃতি এখন যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে তাহা ভগবানের প্রকাশ বা ছদ্মবেশ, রূপ বা বিকৃতি যাহাই মনে হউক না কেন, সে দেখিবে যে তাহা সেই বিশ্বপুরুষের মহত্তর দিব্য প্রকৃতি হইতেই সৃষ্ট। বাহত বস্তুসকল যেমনই বিসদৃশ বা বিশৃঙ্খল দেখা যাউক, যেমনই দুর্ব্বোধ্য হউক, তাহারা আর তাহার এই দৃষ্টির পূর্ণতাকে কিছুতেই এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিবে না বা তাহার বিরোধী হইবে না। সে যে মহত্তর চৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াছে, এইটিই তাহার মূল ভিত্তি, তাহার চতুর্দ্দিকে এই জ্যোতির প্রকাশ অপরিহার্য্য, এইটিই যথার্থ দৃষ্টির একমাত্র সিদ্ধ পন্থা, এক সত্য যাহা দ্বারা অন্য সকল সত্যই সম্ভব হয়।

কিন্তু জগৎ ভগবানের কেবল আংশিক প্রকাশ, ইহা নিজেই ভগবান নহে। প্রাকৃত প্রকাশ যেমনই হউক না কেন, ভগবান তাহা হইতে

অনন্ত গুণে বড়। সকল সম্বন্ধের সকল বন্ধনের অতীত তাঁহার এই আনন্তে তিনি এত উচ্চে রহিয়াছেন যে, যত প্রকারেরই জগৎ হউক না কেন, বিশ্ব-প্রকৃতি যতই অনন্ত বৈচিত্র্যের সহিত অনন্তভাবে বিস্তৃত, প্রকট হউক না কেন, তাঁহাকে কিছুতেই সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে। অতএব মুক্ত জীবের দৃষ্টি বিশ্বজগতের অতীতে পরম ভগবানকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, জগৎ ভগবানের একটি রূপ কিন্তু তিনি সকল রূপের অতীত, দেখিবে যে, ভগবানের অনির্ব্বচনীয় নিরুপাধিক সত্তার মধ্যে জগৎ নিত্য হইলেও একটা গৌণ ক্রম। সে দেখিবে সকল সান্ত ও আপেক্ষিক বস্তু অনাপেক্ষিক অনন্ত ভগবানেরই এক একটি রূপ, এবং সকল সান্ত বস্তুর উর্দ্ধে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়াও সে সেই একই ভগবানে পৌঁছিবে, প্রত্যেক প্রাকৃত ব্যাপার প্রাকৃত জীব এবং আপেক্ষিক ক্রিয়ার উর্দ্ধে সে সর্ব্বদা সেই একই ভগবানকে লক্ষ্য করিবে; এই সকলের দিকে এবং ইহাদের অতীতে দৃষ্টিপাত করিয়া সে ভগবানের মধ্যেই প্রত্যেকের অধ্যাত্ম সার্থকতার সন্ধান পাইবে।

এই সব তাহার মনের কাছে কেবল বুদ্ধির পরিকল্পনা মাত্র হইবে না, জগতের প্রতি এইরূপ মনোভাব কেবল একটা চিন্তার ধারা বা কর্ম্মোপযোগী মতবাদ মাত্র হইবে না। কারণ, তাহার জ্ঞান যদি কেবল এইরূপ পরিকল্পনামূলক হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে একটা দার্শনিক মতবাদ (philosophy), একটা মানসিক রচনা, তাহা অধ্যাত্ম জ্ঞান ও দৃষ্টি হইবে না, অধ্যাত্মভাব ও চেতনা হইবে না। ভগবান ও জগৎকে অধ্যাত্মভাবে দেখা কেবল মানসিক চিন্তামূলক একটা ক্রিয়া নহে,

এমনকি প্রধানতঃ বা মূলতঃও তাহা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মন যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মূর্ত্তি, বস্তু, ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে ও অনুভব করে তাহারই মত বাস্তব, সুস্পষ্ট, সন্নিকট, নিত্য, কার্য্যকরী, নিবিড়। কেবল জড়ানুগত মনই ভাবে যে, ভগবান ও আত্মা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র, নাম, রূপ, প্রতীক বা কল্পনার সাহায্য ভিন্ন ভগবানকে দেখা যায় না, ধারণা করা যায় না। আত্মা আত্মাকে দেখে, দিব্যভাবাপন্ন চেতনা ভগবানকে দেখে ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে বা আরও অধিক প্রত্যক্ষভাবে, ঠিক সেইরূপ নিবিড়ভাবে বা আরও অধিক নিবিড়ভাবে, যেমন জড়ানুগত চৈতন্য জড়বস্তুকে দেখে। ইহা ভগবানকে দেখে, অনুভব করে, ধ্যান করে, ইন্দ্রিয়গোচর করে। কারণ অধ্যাত্ম চেতনার সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ প্রতীয়মান হয় যেন জড়ের জগৎ নহে, প্রাণের জগৎ নহে, এমন কি মনেরও জগৎ নহে, কিন্তু আত্মার জগৎ ; মন প্রাণ ইত্যাদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যেন ভগবৎ-চিন্তা, ভগবৎ-শক্তি, ভগবৎ-রূপ। বাসুদেবের মধ্যে বাস করা, কর্ম্ম করা, ময়ি বর্ত্ততে, বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে। অধ্যাত্ম চেতনা ভগবানকে যে ঐক্যবোধমূলক নিবিড় জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয় তাহা এত অত্যন্ত ভাবে অধিক সত্য যে মনের প্রতীতি বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কখনই সেরূপ হইতে পারে না। এই ভাবেই ইহা সেই বিশ্বাতীত পুরুষকেও অবগত হয় যিনি সমস্ত জগৎলীলার পশ্চাতে ও উর্দ্ধে রহিয়াছেন, যিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরদিন ইহার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। আর এই ভগবান যে নিজের অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত সত্তার দ্বারা জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তন লীলাকে

ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সেই অক্ষর স্বরূপকেও ঐ অধ্যাত্ম চেতনা অবগত হয় সেইরূপ ঐক্যবোধের দ্বারা, আমাদের নিজেদের কালাতীত অপরিবর্ত্তনশীল অবিনাশী সত্তার সহিত ঐ অক্ষর স্বরূপের একত্ব উপলব্ধির দ্বারা; আবার এই ভাবেই ইহা সেই দিব্য পুরুষকেও জানিতে পারে যিনি এই সকল বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে নিজে অবগত হন, যিনি নিজের চেতনায় এই সকল বস্তু ও জীব হইয়াছেন এবং নিজের অনুস্যূত ইচ্ছার দ্বারা তাহাদের চিন্তা ও রূপসকল গঠন করিয়া দিতেছেন, তাহাদের কর্ম্মসকল পরিচালন করিতেছেন ইহা ভগবানকে সকল সম্বন্ধের অতীত বিশ্বাতীত সত্তারূপে, বিশ্বের আত্মা রূপে, আবার জীবের আত্মা, অন্তর পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে নিগূঢ় জ্ঞানে অবগত হয়। এমন কি এই যে বাহ্য প্রকৃতি (external Nature), ইহাকেও সে অবগত হয় ঐক্য-বোধের দ্বারা এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা, কিন্তু সে ঐক্য বৈচিত্র্যের বাধক নহে, তাহা সম্বন্ধকে অস্বীকার করে না, বিশ্বলীলার একই শক্তির বিভিন্ন ক্রম, উচ্চতর এবং নিম্নতর ক্রিয়া স্বীকার করে। কারণ প্রকৃতি ভগবানের বিচিত্র আত্মপ্রকাশলীলার শক্তি, আত্ম-বিভূতি।

সাধারণ মানব মন অজ্ঞানের বশে জগতে প্রকৃতিকে যেরূপ দেখে, অথবা অজ্ঞানের পরিণামে উহা যেরূপ, এই অধ্যাত্ম চেতনা, জগৎ সম্বন্ধে এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কিন্তু সে ভাবে দেখিবে না। এই প্রকৃতিতে অজ্ঞানের যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু অপূর্ণ বা দুঃখময় বা বিকৃত ও ঘৃণ্য, সে-সব ভগবানের প্রকৃতির একটা সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু নহে, কিন্তু তাহাদের পিছনে তাহাদের প্রকৃত মূল রহিয়াছে, তাহাদের পিছনে এমন অধ্যাত্ম

শক্তি আছে যাহার মধ্যে গিয়া তাহারা নিজেদের সত্য সত্তা ও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এক আত্মা ও সৃজনশীলা পরমা প্রকৃতি আছে, যাহার মধ্যে ভগবানের শক্তি ও সঙ্কল্প নিজের পূর্ণ স্বরূপ এবং শুদ্ধ প্রকাশের আনন্দ উপভোগ করে। জগতে আমরা যে-সব শক্তি ক্রিয়মান দেখিতে পাই, তাহাদের পূর্ণতম শক্তি সেইখানেই পাওয়া যায়। সেইটি আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় ভগবানের আদর্শ প্রকৃতিরূপে, সে প্রকৃতি পূর্ণ জ্ঞানের, পূর্ণ তেজ ও ইচ্ছাশক্তির, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের। তাহার অনন্ত গুণ, অগণন শক্তিসকল সেখানে আশ্চর্য্যভাবে বৈচিত্র্যময়, সে-সমুদয় সেই পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ তেজ, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের স্বতস্ফূর্ত্ত অপূর্ব্ব ও সামঞ্জস্যময় আত্মপ্রকাশ। সেখানে সবই হইতেছে সকল আনন্ত্যের বহুমুখী অবাধ ঐক্য। সেই আদর্শ ভগবদ্ প্রকৃতিতে প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক গুণই শুদ্ধ, পূর্ণ, আত্মস্থ, আপন আপন ক্রিয়ায় সামঞ্জস্যময়, সেখানে কোন কিছুই নিজের স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ আত্মবিকাশের জন্য চেষ্টা করে না, সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যের সহিত কর্ম্ম করে। সেখানে সকল ধর্ম্মই (ভগবদ্ শক্তি ও গুণের যাহা যথার্থ ক্রিয়া, গুণ কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম) এক স্বচ্ছন্দ বহুমুখী ধর্ম্ম। ভগবানের সেই চিৎ শক্তি, তপঃ, অপরিসীম স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করে, কোনও একমাত্র ধর্ম্ম বা নীতির বন্ধনে বদ্ধ থাকে না, কোনও এক সঙ্কীর্ণ পদ্ধতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, নিজের অনন্তলীলার আনন্দ নিজেই উপভোগ করে, তাহার আত্মপ্রকাশের সত্যে কখনও পদস্খলন হয় না, তাহা চিরকাল পূর্ণ, সিদ্ধ।

কিন্তু আমরা যে জগতে বাস করিতেছি সেখানে রহিয়াছে নির্ব্বাচন

ও পার্থক্যের ভেদমূলক নীতি। সেখানে আমরা দেখিতে পাই, যে সকল শক্তি ও গুণ প্রকট হইতে চাহিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই যেন শুধু নিজের জন্যই সচেষ্ট, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছে যে-কোনও উপায়ে যতদূর সম্ভব শুধু নিজেরই আত্মপ্রকাশ করিতে এবং অন্যান্য শক্তি ও গুণের নিজ নিজ স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের জন্য সহযোগী বা প্রতিযোগী চেষ্টার সহিত নিজের চেষ্টার ভাল বা মন্দ যাহা সম্ভব কোনও রকম একটা সামঞ্জস্য করিতে চাহিতেছে। এই দ্বন্দ্বময় পার্থিব প্রকৃতির মধ্যেও ভগবান অবস্থান করিতেছেন এবং এই সকল শক্তির ক্রিয়া যে নিগূঢ় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার অব্যভিচারী বিধানে সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই একটা সুসঙ্গতি আনিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই সুসঙ্গতি আপেক্ষিক (relative); মনে হয় উহা এক মূল ভেদ হইতেই উত্থিত, বিভিন্ন জিনিষসকলের ঘাত প্রতিঘাতে একরকম সঙ্গতি হইয়াছে, কোনও মূল ঐক্য হইতে উহার উৎপত্তি নহে। অন্ততঃ মনে হয় যে, ঐ ঐক্য দমিত ও গুপ্ত রহিয়াছে, নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছে না, কখনই মিথ্যা ছদ্মবেশ ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছে না। বস্তুতঃ ইহা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, যতক্ষণ না এই পার্থিব প্রকৃতিতে আবির্ভূত ব্যষ্টিগত জীব নিজের মধ্যে সেই উচ্চতর দিব্য প্রকৃতির সন্ধান পাইতেছে যাহা হইতেই এই নীচের ক্রিয়ার উৎপত্তি। তথাপি জগতে যে সব গুণ ও শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, মানুষে, পশুতে, উদ্ভিদে, জড়পদার্থে নানাভাবে কর্ম্ম করিতেছে, যে কোনও রূপ তাহারা গ্রহণ করুক না কেন, তাহারা সকলেই দিব্য গুণ ও দিব্য শক্তি। সকল শক্তি ও গুণই ভগবানের শক্তি। প্রত্যেকেই ঊর্দ্ধে দিব্য প্রকৃতি হইতে

আসিয়াছে, এখানে নীচের প্রকৃতিতে নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, এই সব বাধা প্রতিবন্ধকের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব উপযোগিতার শক্তিকে বর্দ্ধিত করিতেছে, এবং যখন নিজের আত্মশক্তির শিখরে উঠিতেছে, তখন ভাগবত ভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশের সমীপবর্ত্তী হইতেছে এবং ঊর্দ্ধে পরা আদর্শ দিব্য প্রকৃতির মধ্যে নিজের যে সিদ্ধ স্বরূপ সেই দিকে নিজেকে চালিত করিতেছে। কারণ প্রত্যেক শক্তিই ভগবানের সত্তা ও শক্তি, এবং শক্তির বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ সকল সময়ে ভগবানেরই বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ।

এমনও বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি, ইচ্ছার শক্তি, প্রেমের শক্তি, আনন্দের শক্তি, যে কোনও শক্তি খুব বাড়িয়া উঠিয়া নীচের রূপের গণ্ডীটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে এবং সেই শক্তি ভেদাত্মক ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের অসীমতা ও শক্তির সহিত যুক্ত হয়। ভগবানের দিকে টানের যখন পরাকাষ্ঠা হয়, তখন তাহা মনকে উচ্চতম জ্ঞানের পূর্ণতম দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুক্ত করে, হৃদয়কে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের ভিতর দিয়া মুক্ত করে, সমস্ত জীবনকে এক উচ্চতর জীবন লাভের পূর্ণ ঐকান্তিক সঙ্কল্পের ভিতর দিয়া মুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু এই যে বিস্ফোরণের ফলে নীচের বন্ধন টুটিয়া যায়, আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতির উপর ভগবানের স্পর্শ হইতেই তাহা সম্ভব হয়; তাহা শক্তিটিকে সাধারণ সীমাবদ্ধ দ্বন্দ্বময় ক্রিয়া ও বিষয়সকল হইতে ফিরাইয়া শাশ্বতের দিকে, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত সত্তার দিকে পরিচালিত করে, অনন্তের অভিমুখে, পূর্ণ ভগবানের অভিমুখে লইয়া যায়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া ভাগবত

শক্তি এইরূপ জীবন্তভাবে কার্য্য করিতেছে, এই সত্যই বিভূতি-তত্ত্বের ভিত্তি।

অনন্ত দিব্য শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং গুপ্তভাবে এই নীচের জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছে, পরা প্রকৃতি যে বয়া ধার্য্যতে জগৎ, কিন্তু ইহা নিজেকে পিছনে রাখে, প্রত্যেক প্রাকৃত সত্তার হৃদয়ে নিজেকে লুকাইয়া রাখে, সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে, যতক্ষণ না জ্ঞানের জ্যোতিতে যোগমায়ার আবরণ বিদীর্ণ হইতে মানুষের অধ্যাত্ম সত্তার অর্থাৎ জীবের আছে দিব্য প্রকৃতি। সে হইতেছে এই প্রকৃতিকে ধরিয়া ভগবানের আবির্ভাব, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ, এবং তাহার মধ্যে সমস্ত দিব্য শক্তি ও গুণ, ভাগবত সত্তার জ্যোতি, বল, শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নীচের প্রকৃতিতে আমরা বাস করিতেছি, এখানে জীব নির্ব্বাচনের ও বিশিষ্ট রূপায়ণের নীতি অনুসরণ করে, এবং এখানে শক্তির যে-কোন অংশ, যে-কোন গুণ বা অধ্যাত্ম-ভাব সঙ্গে লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা তাহার আত্মপ্রকাশের বীজ স্বরূপ সম্মুখে আনিয়াছে, সেইটিই হয় তাহার স্বভাবের কার্য্যকরী অংশ, তাহার আত্মবিকাশের মূল ধর্ম্ম এবং সেইটিই তাহার স্বধর্ম্ম, তাহার কর্ম্মের নীতি নির্ণয় করিয়া দেয়। আর কেবল যদি ইহাই সব হইত তাহা হইলে কোনও সমস্যা বা বাধা থাকিত না, মনুষ্যের জীবন হইত ভাগবত সত্তার জ্যোতির্ম্ময় ক্রমবিকাশ। কিন্তু আমাদের জগতের এই যে নীচের শক্তি, অপরা প্রকৃতি, ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান ও অহঙ্কার, ইহা ত্রিগুণময়ী। অহঙ্কার এই প্রকৃতির স্বরূপ, সেইজন্য জীব নিজেকে ভেদাত্মক অহং বলিয়া ধারণা করে; তাহার ন্যায় অপরের

মধ্যেও স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার সহিত সহযোগে বা সংঘর্ষে অহংভাবের বশে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সে জগৎকে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ধরিতে চায়, ঐক্য ও সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া নহে; অহংকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া সে বিরোধকে বাড়াইয়া তোলে। এই প্রকৃতির স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান, মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবং অপূর্ণ ও আংশিক আত্মপ্রকাশ, সেইজন্য সে নিজেকে জানিতে পারে না, নিজের সত্তার ধর্ম্ম সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু বিশ্বশক্তির নিগূঢ় প্রেরণায় সংস্কারের বশে উহার অনুসরণ করে, কষ্টে সৃষ্টে, ভিতরে বহু দ্বন্দ্ব লইয়া অগ্রসর হয়, পথভ্রষ্ট হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সেইজন্য আত্মবিকাশের এই বিশৃঙ্খল ও কষ্টকর প্রয়াস নানা অক্ষমতার, বিকৃতির ও আংশিক আত্মোপলব্ধির রূপ গ্রহণ করে। যখন অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তিমূলক তমোগুণের আধিপত্য হয়, তখন সত্তার শক্তি দুর্ব্বল বিশৃঙ্খলায় সর্ব্বদা অক্ষমতার সহিত কর্ম্ম করে, অজ্ঞানের শক্তিসমূহের অন্ধ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যখন প্রবৃত্তি-বাসনা-ভোগ-মূলক রজোগুণের আধিপত্য হয়, তখন দেখা দেয় একটা সংগ্রাম, একটা চেষ্টা; শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পদে পদে স্খলন হয়, সে চেষ্টা হয় ব্যথাসঙ্কুল, উগ্র; ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত পদ্ধতি ও আদেশের দ্বারা বিপথে চালিত হয়, সত্য ধারণা, পদ্ধতি ও আদর্শসমূহকে বিকৃত ও দূষিত করা হয়, বিশেষতঃ অহঙ্কারকে অতিশয়, এমন কি অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিবার প্রবণতা আসে। যখন জ্যোতি-স্থৈর্য্য-শান্তিমূলক সত্ত্বগুণের আধিপত্য হয়, তখন কর্ম্ম অধিকতর সুসমঞ্জস হয়, প্রকৃতিকে যথাযথ

ব্যবহার করা হয়; কিন্তু এই যে যথাযথ ব্যবহার ইহা ব্যক্তিগত জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, নীচের প্রকৃতির যে মানসিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি এই সবেরই উচ্চতর রূপের ঊর্দ্ধে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না। এই জটিলতার জাল হইতে মুক্ত হওয়া, অজ্ঞান, অহং ও গুণত্রয়ের উপরে উঠা, প্রকৃতপক্ষে ইহাই দিব্য সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম ধাপ। এইরূপে উপরে উঠিয়াই জীব তাহার নিজের দিব্য প্রকৃতির, নিজের সত্য জীবনের সন্ধান পায়।

অধ্যাত্ম চেতনায় জ্ঞানের যে মুক্ত দৃষ্টি তাহা জগৎকে দেখিবার সময় কেবল এই নীচের দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতিকেই দেখে না। আমরা যদি আমাদের এবং অপরের প্রকৃতির কেবল বাহিরের দৃশ্যমান দিকটাই অবলোকন করি, তাহা হইলে সেটা অজ্ঞানের চক্ষুতে দেখা হয়, তাহা হইলে আমরা ভগবানকে সর্ব্বত্র সমানভাবে জানিতে পারি না; সাত্ত্বিক জীবে, রাজসিক জীবে, তামসিক জীবে, দেবতায় ও দানবে, পাপাত্মায় ও পুণ্যবানে, জ্ঞানীতে ও মূর্খে, মহতে ও ক্ষুদ্রে, মানুষে, জন্তুতে, উদ্ভিদে, জড়জগতে সর্ব্বত্র সমানভাবে ভগবানকে দেখিতে পারি না। যিনি জ্ঞানের মুক্ত দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তিনি একই সঙ্গে তিনটি জিনিষ প্রকৃতির সমগ্র নিগূঢ় সত্য বলিয়া দেখেন। প্রথমেই তিনি দেখেন যে, সকলের মধ্যে ভগবদ্ প্রকৃতি গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ক্রমবিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তিনি দেখেন যে, এই ভগবদ্ প্রকৃতিই সকল বস্তুর প্রকৃত শক্তি, এই যে সব বিচিত্র গুণ ও শক্তির আপাতদৃষ্ট ক্রিয়া এসব সেই ভগবদ্ প্রকৃতি হইতেই সার্থকতা লাভ করিতেছে; আর তিনি এই সব ক্রিয়ার অর্থ ইহাদের আপন অহং ও অজ্ঞানের ভাষায় নহে, পরন্তু ভগবদ্

প্রকৃতির আলোকেই দেখিয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পান যে, দেব ও রাক্ষস, মানুষ ও পশু ও পক্ষী ও সরীসৃপ, সাধু ও অসাধু, মূর্খ ও পণ্ডিত, ইহাদের কর্ম্মের মধ্যে যে বিভিন্নতা আপাত দৃষ্ট হয়, সে সব ভগবদ্ গুণ ও শক্তিরই নানা অবস্থায়, নানা ছদ্মবেশের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি ছদ্মবেশের দ্বারা প্রতারিত হন না, কিন্তু প্রত্যেক ছদ্মবেশের অন্তরালেই ভগবানকে চিনিতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টি বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে কিন্তু অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া পিছনে আত্মার যে সত্য রহিয়াছে সেইখানে পৌঁছায়, বিকৃতি ও অপূর্ণতার মধ্যেও আত্মাকে দেখিতে পায়, দেখে যে আত্মা নিজে নিজেকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নিজকে পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, নানারূপ আত্মপ্রকাশ ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অভিমুখে, নিজেরই অনন্ত ও পূর্ণতম সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি বিকৃতি ও অপূর্ণতার উপরেই অযথা ঝোঁক্ দেয় না, কিন্তু সকলকেই দেখিতে পারে হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও উদারতার সহিত, বুদ্ধিতে পূর্ণ বোধের সহিত, আত্মায় পূর্ণ সমতার সহিত। তৃতীয়তঃ তিনি দেখেন আত্ম-প্রকাশের শক্তিসকল ভগবানের দিকেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে; যেখানেই তিনি দেখিতে পান গুণ ও শক্তির সমুচ্চ প্রকাশ, ভাগবত সত্তার প্রদীপ্ত শিখা, যেখানে তিনি দেখেন আত্মা মন প্রাণ নীচের প্রকৃতির সাধারণ স্তর হইতে উঠিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞান, মহান্ শক্তি, তেজ, সক্ষমতা, সাহস, বীরত্ব, প্রেম ও আত্মদানের কল্যাণময় মধুরতা, আবেগ ও মহিমা, পরম পুণ্য, মহৎ কর্ম্ম, মনোহর সৌন্দর্য্য ও সুষমা, দেবতুল্য সুন্দর সৃষ্টি, এই সব অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, সেইখানেই তিনি সেইসবকে

শ্রদ্ধা করেন, অভ্যর্থনা করেন, উৎসাহিত করেন। আত্মার মুক্ত দৃষ্টি মহৎ বিভূতির মধ্যে দেখে যে মানুষের দেবত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

ইহা হইতেছে ভগবানকে শক্তিরূপে চেনা,—ব্যাপকতম অর্থে শক্তি, শুধু বলের শক্তি নহে পরন্তু জ্ঞানের, ইচ্ছার, প্রেমের, কর্ম্মের, পবিত্রতার, মধুরতার, সৌন্দর্য্যের শক্তি। ভগবান সৎ, চিৎ, আনন্দ; জগতের প্রত্যেক জিনিষ সৎএর শক্তি, চিৎএর শক্তি, আনন্দের শক্তি দ্বারা নিজকে বাহিরে প্রকট করিতেছে এবং নিজের দিব্যস্বরূপ লাভ করিতেছে; এই জগৎ ভগবদ্ শক্তির কর্ম্মের জগৎ। ঐ শক্তি অসংখ্য প্রকারের জীবে নিজেকে এখানে নানারূপে গড়িতেছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই তাহার বিশেষ বিশেষ শক্তি রহিয়াছে। প্রত্যেক শক্তিই ভগবানের নিজের এক একটি রূপ; ভগবান সিংহও হইয়াছেন আবার হরিণও হইয়াছেন, দানবও হইয়াছেন আবার দেবতাও হইয়াছেন, আকাশের উপর প্রদীপ্তমান অচেতন সূর্য্য হইয়াছেন, আবার পৃথিবীর উপর মননশীল মানুষও হইয়াছেন। গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতে যে বিকৃতির উদ্ভব তাহা কেবল একটা গৌণ ভাব, মুখ্য ভাব নহে; মূল জিনিষ হইতেছে ভগবদ্ শক্তি যাহা নিজের আত্মপ্রকাশের সন্ধান করিতেছে। উচ্চ মনীষা, বীর, নেতা, সিদ্ধগুরু, ঋষি, নবী, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সাধু, মানব-প্রেমিক, বড় কবি, বড় শিল্পী, বড় বৈজ্ঞানিক, আত্ম-সংযমী সন্ন্যাসী, জগজ্জয়ী শক্তিমান মানব, সকলের মধ্যে ভগবানই নিজেকে প্রকট করিতেছেন। কার্য্যটিও—মহৎ কাব্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ, গভীর প্রেম, মহৎ কর্ম্ম, দিব্য সিদ্ধি, এ-সবই ভাগবতলীলা, ভগবানের আত্মপ্রকাশ।

এই যে সত্য, সকল প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষাই ইহাকে স্বীকার করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু আধুনিক মানব মনের একটা দিক এই সত্যের প্রতি কেমন যেন বিরূপ, ইহার মধ্যে কেবল বল ও শক্তির পূজাই দেখিতেছে, মনে করিতেছে এইভাবে শক্তিমানের পূজা করা অজ্ঞান-প্রসূত, ইহাতে মানুষকে হীন করা হয়, ইহা শুধু আসুরিক অতিমানবের তত্ত্ব। অবশ্য এই সত্যকে লোকে ভুলভাবে গ্রহণ করিতে পারে, বস্তুতঃ সকল সত্যকেই ভুলভাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই সত্যের যথাযোগ্য স্থান আছে, প্রকৃতির দিব্য ব্যবস্থায় ইহার অপরিহার্য্য ক্রিয়া আছে। গীতা সত্যটিকে সেই যথাস্থান ও যথার্থ রূপ দিয়াছে। সকল মানুষ, সকল জীবে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, এই জ্ঞানের উপর ঐ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এই সত্য যেন উচ্চ নীচ, উজ্জ্বল ম্লান সকল প্রকার প্রকাশের প্রতি হৃদয়ের সমতা রাখার বিরোধী না হয়। মূর্খ, নীচ, দুর্ব্বল, অধম, পতিত, সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে হইবে ও ভালবাসিতে হইবে। বিভূতিকেও যে পূজা করিতে হইবে, তাহা বাহ্যিক ব্যক্তিটিকে নহে, কিন্তু যে ভগবান তাহার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন সেই ভগবানকেই পূজা করিতে হইবে (তবে বিভূতির বাহ্য ব্যক্তিস্বরূপকে ভগবানের প্রতীক হিসাবে পূজা করা চলিতে পারে)। কিন্তু তাই বলিয়া এই সত্যটিকে অস্বীকার করা যায় না যে, প্রকাশেরও উচ্চ নীচ ক্রম আছে; প্রকৃতি তাহার আত্মপ্রকাশের ধারায় স্তরে স্তরে উর্দ্ধের দিকে চলিয়াছে, অনিশ্চিত, অস্পষ্ট, অস্ফুট প্রতীকসকল হইতে ভগবানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশের দিকে চলিয়াছে। প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তি, প্রত্যেক মহৎ কর্ম্ম, প্রকৃতির নিজেকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্যের

নিদর্শন, এবং সর্ব্বশেষ ও পরম ঊর্দ্ধায়নের আশ্বাস। প্রকৃতির বিকাশে মানুষ নিজেই পশু পক্ষী সরীসৃপের তুলনায় একটা উচ্চতর ক্রম, যদিও সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্ম রহিয়াছেন, সমং ব্রহ্ম। কিন্তু মানুষ নিজেকেও অতিক্রম করিয়া যত ঊর্দ্ধতম শিখরে উঠিতে পারে এখনও সেখানে পৌছায় নাই; ইতিমধ্যে যখনই তাহার মধ্যে আত্মবিকাশের কোনও মহত্তর শক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে, সেইটিকেই তাহার পরম ঊর্দ্ধগতির আশা ও সূচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে-সকল অগ্রগামী মহাজন নিজেদের যে-কোনরূপ সিদ্ধির দ্বারা মানুষকে অতিমানবত্বের সম্ভাবনা দেখইয়া দেন বা সেই দিকে পরিচালিত করেন তাঁহাদের চিহ্নিত পথের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিলে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের অশ্রদ্ধা করা হয় না, বরং সে শ্রদ্ধা আরও উচ্চ, আরও গভীরতর অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠে।

অর্জ্জুন নিজেই একজন বিভূতি; অধ্যাত্মবিকাশে তিনি একজন উচ্চস্তরের মানব, সমসাময়িক জনগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি নারায়ণের, মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানের, নির্ব্বাচিত যন্ত্র। এক স্থানে গুরু সকলের পরম ও এক আত্মারূপে বলিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, আবার অন্যান্য স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়, তাঁহার ভক্ত, সেই জন্যই তিনি অর্জ্জুনের ভার লইয়াছেন, তাঁহাকে পথ দেখাইতেছেন, দৃষ্টি ও জ্ঞান দিবার জন্য তিনি অর্জ্জুনকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এখানে গুরুর কথায় বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ কোনই বিরোধ নাই। বিশ্বের আত্মারূপে ভগবদ্‌শক্তি সকলের প্রতিই সমান, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ম্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন, কিন্তু পুরুষোত্তমের সহিত মানুষের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধও

আছে, যে-মানব তাঁহার নিকট আসে তিনিও বিশেষ করিয়া তাহার নিকটে যান। এই যে সব বীর ও শক্তিমান পুরুষ কুরুক্ষেত্রের মহাসমর প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন, ইহারা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র, প্রত্যেকের ভিতর দিয়া প্রত্যেকের স্বভাব অনুসারে ভগবানই কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অহংএর অন্তরালে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছেন। অর্জ্জুন এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন যখন তাঁহার এই অজ্ঞান আবরণ ভেদ করা যাইতে পারে এবং মানবদেহে অবতীর্ণ ভগবান তাঁহার বিভূতিকে তাঁহার কর্ম্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারেন। এমন কি এইরূপ প্রকাশ অপরিহার্য্য। অর্জ্জুন এক মহান কর্ম্মের যন্ত্র, সে কর্ম্ম বাহ্যত অতি ভীষণ বটে, কিন্তু মানবজাতিকে প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করাইয়া দিবার জন্য তাহা প্রয়োজনীয়, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে মানবজাতির যে প্রয়াস তাহার সহায়তায় এই যুদ্ধ একটি প্রধান ঘটনা। মানবের যুগবিবর্ত্তনের ইতিহাস, মানবের আত্মা ও প্রাণে ভাগবত সত্তারই ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশ এহ ইতিহাসের প্রত্যেক মহান ঘটনা ও অবস্থা ভগবানেরই এক একটি আবির্ভাব। অর্জ্জুন ভগবানের নিগূঢ় ইচ্ছার যন্ত্র, কুরুক্ষেত্রের মহান কর্ম্মী, তিনি যাহাতে কার্য্যটিকে ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া জানিয়াই সজ্ঞানে করিতে পারেন সেই জন্য তাঁহাকে দিব্য মানব হইতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই সে কর্ম্ম অধ্যাত্মভাবে প্রাণময় হইয়া উঠিবে, তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক সার্থকতা, তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের জ্যোতি ও শক্তি লাভ করিবে। অর্জ্জুনকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আহ্বান করা হইল; তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, ভগবানই এই বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের সকল জীব, সকল ঘটনার

উৎপত্তিস্থল, সমস্তই প্রকৃতিতে ভগবানের আত্ম-প্রকাশ, সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে হইবে। তাহার নিজের মধ্যে মানুষরূপে ও বিভূতিরূপে ভগবানকে দেখিতে হইবে, নীচ উচ্চ সকল স্তরের সত্তার মধ্যে ভগবানকে দেখিতে হইবে, উচ্চতম শিখরে ভগবানকে দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে মানুষও উন্নত অবস্থায় বিভূতি, সেখান হইতে পরম মুক্তি ও মিলনের মধ্যে উচ্চতম শিখরে উঠিতেছে। কাল যে সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতেছে, সেটিকেও ভগবানের রূপ, ভগবানের পদক্ষেপ বলিয়া দেখিতে হইবে,—সেই পদক্ষেপে জগতের যুগান্তর সাধিত হয়, মানুষের মধ্যে ভগবদ সত্তা সেই যুগান্তরের বেগকে অবলম্বন করিয়া জগৎ মাঝে বিভূতি রূপে ভগবদ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে লোকাতীত পরম সিদ্ধি লাভ করে। অর্জ্জুনকে এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, এখন তাঁহাকে ভগবানের মহাকালরূপ দেখান হইবে এবং সেই রূপের সহস্র সহস্র মুখ হইতে মুক্ত বিভূতির প্রতি ভগবদ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত আদেশ ঘোষিত হইবে।

বিশ্বরূপ দর্শন

সংহারক মহাকাল

বিশ্বরূপ দর্শন গীতার একটি সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত এবং কবিত্বশক্তিপূর্ণ অংশ, কিন্তু গীতার চিন্তাধারায় ইহার যে-বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে সেইটি সহসা ধরিতে পারা যায় না। ইহা যে একটি কবিত্বময় ও দিব্যার্থময় রূপক তাহা সুস্পষ্ট, এবং আমাদিগকে দেখিতে হইবে কি ভাবে ইহাকে আনা হইয়াছে, কি উদ্দেশ্যে আনা হইয়াছে, আবিষ্কার করিতে হইবে ইহার গূঢ়ার্থব্যঞ্জক অংশগুলির নির্দ্দেশ কি, তবেই আমরা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। যে-অধ্যাত্মসত্তা ও শক্তি এই বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে তাহার জীবন্ত রূপ, অদৃশ্য ভগবানের দৃষ্ট মহত্ত্ব, তাঁহার স্থূল শরীরটিই দেখিবার জন্য অর্জ্জুনের যে-ইচ্ছা তাহার দ্বারাই তিনি ইহাকে আহ্বান করিলেন। জগতের যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম তত্ত্ব তাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, ভগবান হইতেই সব, সবই ভগবান এবং সকল বস্তুর মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন, লুক্কায়িত রহিয়াছেন, এবং প্রত্যেক সসীম সত্তার মধ্যেই তাঁহাকে প্রকট করিতে পারা যায়*। যে-মোহ

---

* মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহঽয়ং বিগতো মম ॥ ১১।১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ১১।২

এমন দৃঢ়ভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বস্তুসকল ভগবান ছাড়া নিজেদের মধ্যেই নিজেদিগকে লইয়া থাকিতে পারে অথবা প্রকৃতির অধীন কোনও জিনিষ স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, নিজেদিগকে পরিচালিত করিতে পারে, এই ধারণা অর্জ্জুনের চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়াছে, ঐটিই ছিল তাঁহার সংশয়ের, তাঁহার বিমূঢ়তার, তাঁহার কর্ম্ম-ত্যাগের প্রকৃত কারণ। এখন তিনি জানিয়াছেন যে, সত্তাসকলের উৎপত্তি ও লয়ের প্রকৃত অর্থ কি। তিনি জানিয়াছেন যে, দিব্য চৈতন্যময় আত্মার অব্যয় মাহাত্ম্যই এই দৃশ্য প্রপঞ্চের নিগূঢ় তত্ত্ব। সর্ব্বভূতের মধ্যে এই যে মহান শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা, সবই তাঁহার যোগ এবং সকল ঘটনা সেই যোগেরই পরিণাম ও প্রকাশ, নিখিল প্রকৃতি সেই গোপন ভগবদ্ সত্তায় পূর্ণ এবং নিজের মধ্যে তাহাকে প্রকট করিতে প্রয়াসী। কিন্তু অর্জ্জুন সেই ভগবদ্‌সত্তার স্থূলরূপ ও শরীরটিও দেখিতে চান, যদি তাহা সম্ভব হয়*। তিনি তাঁহার গুণসকল শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার আত্মপ্রকাশের ধারা কি, ক্রম কি তাহাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু এখন তিনি সেই তাঁহার অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করান। অবশ্য তাঁহার নিষ্ক্রিয় অক্ষর সত্তার অরূপ স্তব্ধতা নহে, পরন্তু সেই পরম রূপ যাহা হইতে সকল তেজ ও কর্ম্মের উৎপত্তি, সকল রূপ যাহার ছদ্মবেশ, যিনি

---

* এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ১১।৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১১।৪

বিভূতিতে নিজের শক্তি প্রকট করেন,—কর্ম্মের ঈশ্বর, জ্ঞান ও ভক্তির ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং তাহার সকল জীবের ঈশ্বর। এই মহত্তম সর্ব্বব্যাপী দর্শনের জন্য তাঁহাকে প্রর্থনা করান হইল কারণ এই ভাবেই বিশ্বরূপে প্রকট পরমাত্মার নিকট হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মে তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

অবতার উত্তর দিলেন, তোমাকে যাহা দেখিতে হইবে, মানবীয় চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না, কারণ মানুষের চক্ষু কেবল জিনিবসকলের বাহ্যিক রূপই দেখিতে পায় অথবা তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকরূপে দেখে, ইহারা প্রত্যেকে অনন্ত রহস্যের কেবলমাত্র কয়েকটি দিকের আভাস দেয়*। কিন্তু দিব্যচক্ষু আছে, অন্তরতম দৃষ্টি, তাহার দ্বারা পরম ভগবানকে তাঁহার যোগশক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই চক্ষু এখন আমি তোমাকে দিতেছি। তুমি দেখিবে আমার নানাবিধ, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির শত শত সহস্র সহস্র দিব্য রূপ; তুমি দেখিবে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, মরুতগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়; তুমি এমন অনেক অদ্ভুত জিনিষ দেখিবে

---

* ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৮
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১১।৫-৭

যাহা কেহ কখনও দেখে নাই; আমার দেহের মধ্যে সমগ্র জগৎকে সংগ্রথিত ও একত্রিত দেখিতে পাইবে। এইটিই তাহা হইলে মূলভাব, ভিতরের অর্থ। ইহা হইতেছে বহুর মধ্যে এককে দর্শন, একের মধ্যে বহুকে দর্শন—সবই সেই এক। দিব্যযোগের চক্ষুতে এই যে দর্শন ইহাই মুক্তি আনিয়া দেয়, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু হইবে সে-সবেরই সার্থকতা দেখাইয়া দেয়, সবেরই ব্যাখা করিয়া দেয়। একবার এই দর্শন লাভ করিতে পারিলে এবং ইহাকে ধারণ করিতে পারিলে, ইহা ভগবদ্ জ্যোতির কুঠারে সকল সংশয় ও ভ্রান্তির মূল ছিন্ন করিয়া দেয় এবং সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই যে দর্শন ইহা সামঞ্জস্য করে, ঐক্যসাধন করে। এই দর্শনে ভগবানকে যে-ভাবে দেখা যায় যদি তাহার সহিত আত্মা ঐক্যবোধ লাভ করিতে পারে (অর্জ্জুন এখনও তাহা পারেন নাই, তাই আমরা দেখি তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন), জগতে ভীষণ যাহা কিছু আছে সে-সবের ভীষণতা দূর হইয়া যায়। সেইটিকেও আমরা ভগবানেরই একটি রূপ বলিয়া দেখিতে পাই, এবং যখন আমরা ইহার মধ্যে তাঁহার দিব্য উদ্দেশ্যের সন্ধান পাই, শুধু এইটিকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখি না, তখন আমরা সর্ব্বতোমুখী আনন্দ ও বিপুল সাহসের সহিত জগৎকে সমগ্রভাবেই বরণ করিয়া লইতে পারি, আমাদের উপর যে-কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে অবিচলিত পদবিক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারি। যে-দিব্য জ্ঞান সকল জিনিষকে ঐক্যের দৃষ্টিতে দেখে, বিচ্ছিন্নভাবে আংশিকভাবে দেখে না এবং সেইজন্যই বিমূঢ় হয় না, আত্মা একবার সেই জ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে জগৎকে এবং যাহা কিছু সে দেখিতে ইচ্ছা করে

সবকেই নূতনভাবে আবিষ্কার করিতে পারে, যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি। সকলের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনকারী, ঐক্য-স্থাপনকারী এই দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দিব্য-জ্ঞান হইতে পূর্ণতর দিব্যজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

তাহার পর পরম ঐশ রূপ অর্জ্জুনের দৃষ্টিগোচর করা হইল*। সে-রূপ অনন্ত ভগবানের, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র এবং তাঁহার মধ্যে সমস্ত আশ্চর্য্যময় সৃষ্টি, তিনি তাঁহার সত্তার যে-সকল অপরূপ প্রকটন করিতেছেন তাহাদের শেষ নাই—সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত ভগবান তিনি, অসংখ্য চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন, অসংখ্য মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন, অসংখ্য দিব্য-অস্ত্রে তিনি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত, দিব্য আভরণে ভূষিত, দিব্য-বস্ত্র-পরিহিত, দিব্য পুষ্পের মালায় অলঙ্কৃত, দিব্য সৌগন্ধ্যে

---

* এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১১।৯-১৪

অনুলিপ্ত। ভগবানের এই শরীরের এমন প্রভা যেন আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য্য উদিত হইয়াছে। সেই দেবদেবের শরীরে সমগ্র জগৎ বহুধা বিভক্ত অথচ একীভূত দেখা যাইতেছে। অর্জ্জুন দেখিলেন অত্যাশ্চর্য্যময়, সুন্দর, ভীষণ ভগবান, জীবগণের অধিপতি, যিনি তাঁহার অধ্যাত্মসত্তার মহিমা ও মহত্ত্বে এই উদ্দাম ও বিকট, সুশৃঙ্খলাময় ও চমৎকার, মধুর ও ভয়ঙ্কর জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন, এবং তিনি বিস্ময়ে, হর্ষে, ভয়ে অভিভূত হইয়া অবনতমস্তকে নমস্কারপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণবাক্যে করযোড়ে সেই বিরাট মূর্ত্তির স্তব করিতে লাগিলেন—"হে দেব, তোমার দেহে আমি সকল দেবতা, বিশেষ বিশেষ ভূতবর্গ, কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং ঋষিগণ ও দিব্য সর্পগণকে দর্শন করিতেছি*। আমি দেখিতেছি

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিনং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য মুখ; সর্ব্বত্র আমি তোমার অনন্তরূপ দর্শন করিতেছি, কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি তোমার অন্ত, মধ্য, আদি দেখিতে পাইতেছি না। আমি তোমাকে দেখিতেছি কিরীটী, গদাচক্রধারী, আমার চতুর্দ্দিকে দীপ্তিমান, তেজোপুঞ্জ তুমি দুর্ণিরীক্ষ্য, সর্ব্বব্যাপী দ্যুতি, সূর্য্য-প্রভ, অগ্নি-প্রভ অপ্রমেয়। তুমি পরম অক্ষর এবং তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আধার ও আশ্রয়, তুমিই শাশ্বত ধর্ম্মসমূহের অবিনশ্বর প্রতিপালক, তুমিই সনাতন পুরুষ।

কিন্তু এই মহান রূপের মধ্যেই ভীষণ সংহারকেরও মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই যে অপ্রমেয়, যাঁহার অন্ত নাই, মধ্য নাই, আদি নাই, ইহারই মধ্যে সকল জিনিষের উদ্ভব, স্থিতি ও লয় †। এই যে-ভগবান অসংখ্য বাহুর

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১১।১৫-১৮

† অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতম্ রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

দ্বারা জগৎসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন এবং কোটি কোটি হস্তের দ্বারা সংহার করিতেছেন, সূর্য্য ও চন্দ্রসকল যাঁহার চক্ষু, ইঁহার মুখমণ্ডলে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত, এবং নিজ তেজবহ্নিতে তিনি নিরন্তর নিখিল বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছেন। তাঁহার রূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও চমৎকার; একাকীই তাহা দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সমগ্র ব্যবধান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ভীতান্তঃকরণে স্তব করিতে করিতে সুরসঙ্ঘ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "শান্তি হউক, কল্যাণ হউক" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বহুলভাবে স্তব করিতেছেন। দেবগণ, রুদ্রগণ, গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুরগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইতেছে। তাঁহার নয়নসকল প্রদীপ্ত ও বিশাল; তাঁহার মুখমণ্ডল করাল দ্রংষ্ট্রাযুক্ত এবং ভক্ষণ করিবার জন্য বিস্ফারিত; প্রলয় কালের হুতাশন সদৃশ তাঁহার ভীষণ আনন ‡। সেই মহাযুদ্ধে

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর সিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২

‡ রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।

উভয়পক্ষের নৃপতিগণ, সেনাপতিগণ, বীরগণ তাঁহার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসমূহের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে কেহ কেহ তাঁহার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন, তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া

বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহহম্ ॥২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাহসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮

যাইতেছে; যেমন বহু নদী সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয় অথবা যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনিই লোকসমূহ অবশভাবে মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তাঁহার অগ্নিময় মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সেই সকল প্রদীপ্ত বদন লইয়া সেই করাল মূর্ত্তি চারিদিক লেহন করিতেছেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার অগ্নিময় তেজে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁহার অত্যুগ্র দীপ্তিতে সন্তপ্ত। জগৎ এবং তাহার লোকসমূহ ধ্বংস-ভয়ে কম্পিত ও ব্যথিত, এবং চারিদিকে যে ভয় ও যন্ত্রণা অর্জ্জুনও তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সেই করাল মূর্ত্তি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই উগ্র মূর্ত্তিধারী তুমি কে, আমাকে বল। হে দেববর, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। আদিপুরুষ তোমাকে জানিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কারণ তোমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা আমি বুঝিতেছি না।"

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০

আখ্যা হি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১

অর্জ্জুনের এই যে শেষ প্রশ্ন ইহার মধ্যে বিশ্বরূপের দুইটি ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইটি হইতেছে সনাতন চির-পুরাতন বিশ্বপুরুষের রূপ, সনাতনম্ পুরুষম্ পুরাণম্, ইনিই চিরকাল সৃষ্টি করিতেছেন কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ইঁহারই দেহে দৃশ্য দেবগণের মধ্যে একজন, তাঁহা হইতেই সর্ব্বদা জগতের স্থিতি কারণ তিনিই শাশ্বত ধর্ম্মসকলের প্রতিপালক, কিন্তু তিনিই আবার সর্ব্বদা ধ্বংস করিতেছেন যেন পুনরায় নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কাল, তিনি মৃত্যু, তিনি শান্ত ও মহিমাময় নটরাজ রুদ্র, তিনি কালী মুণ্ডমালা পরিয়া উলঙ্গিনী হইয়া সমরে নৃত্য করিতেছেন এবং নিহত অসুরগণের শোণিতে নিজেকে রঞ্জিত করিতেছেন, তিনিই ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত, দাবানল, ভূমিকম্প, তিনিই দুঃখ দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, ধ্বংস এবং সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্র। আর এই যে তাঁহার শেষোক্ত রূপ, এইটিই তিনি এখন সম্মুখে ধরিলেন। এই রূপের সম্মুখ হইতে মানুষের মন স্বভাবতঃই প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং সে চক্ষু মুদিয়া থাকে এই আশায় যে সে নিজে না দেখিলে হয়ত বা সেই ভীষণ মূর্ত্তি তাহাকে দেখিতে পাইবে না। মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় শুধু চায় মনোরম ও আরামদায়ক সত্য, আর তাহা না পাওয়া গেলে চায় মনোরম মিথ্যা কাহিনী, ইহা সত্যকে তাহার পূর্ণতায় চায় না কারণ তাহার মধ্যে অনেক কিছুই আছে যাহা স্পষ্ট নহে, মনোরম নহে, আরামপ্রদ নহে, পরন্তু বুঝা কঠিন এবং সহ্য করা আরও কঠিন। অপক্ক ধর্ম্মপন্থী, তরলবুদ্ধি আশাবাদী, ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী, ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের দাস মানুষ, নির্ম্মম সিদ্ধান্ত সকলকে, বিশ্বজগতের কর্কশ ও ভীষণ দিকগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা উড়াইয়া দিতে চায়। ভারতের ধর্ম্মকে অনেকেই

অজ্ঞভাবে নিন্দা করিয়া থাকে কারণ উহা এই লুকোচুরি খেলায় যোগ দেয় নাই, বরং ভগবানের যেমন মধুর ও সুন্দর ভাবগুলির তেমনিই ভীষণ ভাবগুলিরও প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে এবং সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়াছে। কিন্তু ইহার সুদীর্ঘ চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মসাধনার গভীরতা ও উদারতার কল্যাণে ইহা এই সব দৌর্ব্বল্যসূচক সঙ্কোচ অনুভব করে নাই বা সে-সবকে প্রশ্রয় দেয় নাই।

ভারতের আধ্যাত্মিকতা জানে যে, ভগবান প্রেমময়, শান্তিময় এবং সুস্থির শাশ্বত,—যে গীতা আমাদিগকে এই সব ভীষণ রূপ দর্শন করাইয়াছে, সেই গীতাই বলিয়াছে যে, ভগবান সর্ব্বভূতের প্রেমিকরূপে, সুহৃদরূপে তাহাদের মধ্যে প্রকট। কিন্তু তাঁহার দিব্যভাবে জগৎপরিপালনের নির্ম্মম দিকও রহিয়াছে, ধ্বংসের দিক, এবং তাহা প্রথম হইতেই আমাদের চক্ষে পড়ে; এইটিকে দেখিতে অস্বীকার করার অর্থ ভগবদ প্রেম, শান্তি, নির্ব্বিকারতা ও আনন্দের পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হওয়া, এমন কি তাহার উপরে একটা পক্ষপাত ও মিথ্যার ভাব আরোপ করা হয়, কারণ ইহাকে যে একান্ত প্রীতিদায়ক রূপ দেওয়া হয়, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহার প্রকৃতির সহিত মোটের মিল হয় না। এই যে আমাদের সংগ্রামের, কষ্টকর প্রয়াসের জগৎ, ইহা ভীষণ, বিপজ্জনক, ধ্বংসকারী, গ্রাসকারী জগৎ, এখানে জীবনের অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্গুর, মানুষের আত্মা ও দেহ এখানে অসংখ্য বিপদের মধ্যে বিচরণ করে, এইটি এমন জগৎ যে এখানে আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, কোন কোন জিনিষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হয়, এখানে জীবনের প্রত্যেক নিশ্বা

মরণেরও নিশ্বাস। যাহা কিছু অশুভ বলিয়া, ভীষণ বলিয়া আমাদের মনে হয়, সে-সবের দায়িত্ব একটি প্রায়-সর্ব্বশক্তিমান সয়তানের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া, অথবা প্রকৃতির অংশ বলিয়া উপেক্ষা করা এবং এই-ভাবে ভগবদ্ প্রকৃতি এবং জাগতিক প্রকৃতির মধ্যে এক অনতিক্রমনীয় ব্যবধানের সৃষ্টি করা, যেন প্রকৃতি ভগবান ছাড়া একটা কিছু, অথবা সমস্ত দায়িত্ব মানুষ এবং তাহার পাপের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, যেন জগৎ কিরূপ হইবে সে-বিষয়ে তাহার মতের খুব প্রাধান্য ছিল বা সে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারিত,—এইসব কৌশলের দ্বারা লোকে যে কোনরকমে নিজেদিগকে ভুলাইতে চায়, ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তাধারা কখনও এ-সবের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আমাদিগকে সাহসভরে সত্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, আর কেহ নহে স্বয়ং ভগবানই নিজের সত্তার মধ্যে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এম্নি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রকৃতি নিজের সন্তানগণকে উদরসাৎ করিতেছে, কাল জীবসকলের জীবন গ্রাস করিতেছে, সর্ব্বব্যাপী ও অপরিহার্য্য মৃত্যু, এবং মানুষে ও প্রকৃতিতে রুদ্র শক্তিসকলের প্রচণ্ডতা, এই সবই হইতেছে পরম ভগবানের বহু বিশ্বরূপের একটি রূপ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ভগবান মুক্ত-হস্ত অমিত সৃষ্টিকর্ত্তা, সাহায্যদাতা, শক্তিমান ও করুণাময় রক্ষাকর্ত্তা, আবার সেই ভগবানই গ্রাসকর্ত্তা ও ধ্বংসকর্ত্তা। সুখ ও মাধুর্য্য ও আনন্দ যেমন তাঁহার স্পর্শ, তেমনই যে দুঃখ ও অশুভের পীড়ন-যন্ত্রে আমরা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করি তাহাও তাঁহারই স্পর্শ। যখন আমরা পূর্ণ মিলনের দৃষ্টি লইয়া দেখি এবং

আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশে এই সত্য অনুভব করি, কেবল তখনই আমরা সেই ছদ্মবেশেরও পশ্চাতে সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের শান্ত ও সুন্দর মুখ পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিতে পারি, এবং এই যে বেদনার স্পর্শ আমাদের দোষ ত্রুটির পরীক্ষা করে তাহার মধ্যেও মানুষের বন্ধুর, মানুষের অধ্যাত্মজীবন-বিকাশকর্ত্তার সন্ধান পাইতে পারি। জগতে যে-সব দ্বন্দ্ব বিরোধ, সে-সব ভগবানেরই দ্বন্দ্ব বিরোধ, আর কেবল সেই সবকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদের মধ্য দিয়া যাইয়াই আমরা তাঁহার পরম সামঞ্জস্যের মহত্তর সুসঙ্গতিগুলির মধ্যে, তাঁহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত আনন্দের শিখর ও অনন্তপ্রসারী পুলকস্পন্দনসকলের মধ্যে উপনীত হইতে পারি।

গীতা যে-সমস্যাটি তুলিয়াছে এবং তাহার যে সমাধান দিয়াছে, তাহাতে বিশ্বপুরুষকে এই স্বরূপেই দেখাইতে হয়। সমস্যাটি হইতেছে এক বিরাট যুদ্ধের, ধ্বংসের, হত্যাকাণ্ডের যাহা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবদিচ্ছার দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহাতে চির-অবতার নিজে প্রধান যোদ্ধার রথের সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই রূপ যিনি দর্শন করিতেছেন তিনি নিজেই সেই প্রধান যোদ্ধা, সংগ্রামপরায়ণ মানবাত্মার প্রতিভূ তিনি, তাঁহাকে তাঁহার ক্রমবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ নির্ম্মম ও অত্যাচারী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে এবং এক উচ্চতর অধিকারের, মহত্তর ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন ও উপভোগ করিতে হইবে। যে-বিরাট উপপ্লবে আত্মীয় আত্মীয়কে হত্যা করে, জাতিসকল সমূলে বিনষ্ট হয়, সমগ্র সমাজই বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের আবর্ত্তে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়, তাহার ভীষণ স্বরূপে বিকল হইয়া তিনি পিছাইয়া

পড়িয়াছেন, নিয়তির নির্দ্ধারিত কর্ম্ম করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার দিব্য বন্ধু ও দিশারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কেন তাঁহাকে এই ভীষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইল, কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি ? তখন তাঁহাকে দেখান হইয়াছে, যে-কোন কর্ম্মই সে করুক না কেন, কেমন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে সেই কর্ম্মের বাহ্যিক স্বরূপের উপরে উঠা যায়, কেমন করিয়া দেখা যায় যে, কার্য্যনির্ব্বাহকশক্তিরূপিণী প্রকৃতিই কর্ম্মের কর্ত্তা, তাঁহার প্রাকৃত সত্তা যন্ত্রস্বরূপ, ভগবান প্রকৃতির এবং কর্ম্মসকলের অধীশ্বর, কোনরূপ বাসনা বা স্বার্থপরতা না রাখিয়া সকল কর্ম্মই যজ্ঞরূপে তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহাকে আরও দেখান হইয়াছে যে, ভগবান এই সব জিনিষের উর্দ্ধে রহিয়াছেন, তাহাদের-স্পর্শের অতীত, অথচ তিনি মনুষ্যে ও প্রকৃতিতে ও তাহাদের কর্ম্মে নিজেকে প্রকট করিতেছেন এবং সংসারের সব কিছুই ভগবানের এই লীলাবর্ত্তের অঙ্গ। কিন্তু এখন তাঁহাকে এই সত্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহের সম্মুখীন করা হইল, এই মহান ভগবদ রূপের মধ্যে তিনি ভীষণতা ও ধ্বংসের দিকটিকে অতিশয় পরিবর্দ্ধিতাকারে দেখিলেন, তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ সর্ব্বাত্মাকে এমন করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে হয় কেন ? এই যে মর-জীবন সৃজন ও ধ্বংসের বহ্নি, এই জগৎব্যাপী সংগ্রাম, অনর্থকারী বিপ্লবের এইরূপ পুনঃ পুনঃ সংঘটন, জীবগণের এই কষ্টকর প্রয়াস, নিদারুণ দুঃখ ও যন্ত্রণা ও মৃত্যু—এ-সবের কি অর্থ ? তিনি সেই পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শাশ্বত প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন— "আমাকে বল, এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে ? আদিপুরুষ তোমাকে

জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; কারণ আমি তোমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা কিছুই জানি না। তুমি প্রসন্ন হও"*।

ভগবান উত্তর দিলেন, ধ্বংসই আমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা, সেই সঙ্কল্প লইয়াই আমি এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ("ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" মানবের কর্ম্মক্ষেত্রেরই রূপক) দণ্ডায়মান হইয়াছি, মহাকালের গতিতে এই জগৎব্যাপী ধ্বংসকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই দৃষ্ট আমার এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা অনিবার্য্যরূপেই সিদ্ধ হইবে, কোন মানুষ যোগ দিক বা না দিক কিছুতেই সে-উদ্দেশ্যকে বাধা দিতে, পরিবর্ত্তন করিতে বা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না; মানুষ পৃথিবীতে আদৌ তাহা সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে আমার সঙ্কল্পের শাশ্বত দৃষ্টিতে আমি পূর্ব্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি। মহাকালরূপে আমাকে পুরাতন সংগঠন সকলকে ধ্বংস করিতে হয় এবং নূতন, মহান, গরিমাময় রাজ্য গড়িয়া তুলিতে হয়। এই যুদ্ধ তুমি নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহাতে ভাগবত শক্তি ও জ্ঞানের মানবীয় যন্ত্রস্বরূপ তোমাকে ধর্ম্মের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং ধর্ম্মবিরোধী-গণকে নিধন করিতে হইবে, জয় করিতে হইবে। প্রকৃতিতে আবির্ভূত মানবাত্মা তুমি, আমি প্রকৃতির ক্ষেত্রে তোমকে যে ফল প্রদান করিব, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের রাজ্য, তাহাও তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। ইহাই

---

* আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌॥ ১১।৩১

যেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়—তোমার আত্মায় ভগবানের সহিত এক হওয়া, তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লওয়া, তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করা, জগতে এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে, শান্তভাবে তাহা অবলোকন করা। "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি, লোক-সকলকে ধ্বংস করাই এখানে আমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না*। অতএব উঠ, যশোরাশি লাভ কর, তোমার শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। তাহারা ইতিপূর্ব্বে আমারই দ্বারা নিহত হইয়া আছে, হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাত্র হও। আমার দ্বারা যাহারা নিহত হইয়াছে সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর

* কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

যোদ্ধাগণকে বধ কর, ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইও না। যুদ্ধ কর, তুমি শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিবে।” এই মহান ও ভীষণ কর্ম্মের ফল কি হইবে সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল, মানুষ যে বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ফল কামনা করে সে ফল নহে,—কারণ কর্ম্মফলে আসক্তি রাখা চলিবে না—পরন্তু ভগবদিচ্ছার পরিপূরণ, যে-কার্য্যটি করিতে হইবে তাহার সম্পাদনের গৌরব ও সাফল্য, এই গৌরব ভগবান বিভূতিরূপে নিজেকেই দিতেছেন। এই ভাবেই সেই জগৎ-যুদ্ধের প্রধান নায়ককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার শেষ ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রদান করা হইল।

যিনি কালের অতীত তিনিই মহাকাল ও বিশ্ব-পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া আদেশ প্রদান করিলেন। কারণ ভগবান যখন বলিলেন, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ, আমি সত্তাসকলের ধ্বংসকারী মহাকাল, তাহার অর্থ নিশ্চয়ই ইহা নহে যে, তিনি শুধুই মহাকাল এবং মহাকালের সমগ্র মূল তত্ত্বই হইতেছে ধ্বংস করা। কিন্তু এইটিই বর্ত্তমানে তাঁহার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা, প্রবৃত্তি। ধ্বংস সকল সময়েই সৃষ্টির সহিত এক সঙ্গে বা পর্য্যায়ক্রমে চলে, এবং এইভাবে সমতালে ধ্বংস ও নব-সৃষ্টি করিতে করিতেই জীবনের অধীশ্বর তাঁহার রক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করেন। তাহা ছাড়া ধ্বংস হইতেছে প্রগতির জন্য প্রথম প্রয়োজন। অন্তর রাজ্যে যে মানুষ তাহার নীচের সত্তার রূপগুলিকে ধ্বংস না করে, সে উচ্চতর জীবনের মধ্যে উঠিতে সক্ষম হয় না। বাহিরের রাজ্যেও যে রাষ্ট্র বা জনসমাজ বা জাতি তাহার জীবনের প্রাচীন রূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং পুনর্গঠন করিতে খুব বেশী দিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করে, সে নিজেই

ধ্বংসের অধীন হয়, জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার ধ্বংসস্তুপ হইতে অন্য রাষ্ট্র, জনসমাজ এবং জাতি গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে যে-সব অতিকায় জীব এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াই মানুষ পৃথিবীতে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে। দানবগণকে বধ করিয়াই দেবগণ বিশ্বে ভগবদবিধানের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। যে-কেহ অকালে এই যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতিকে উঠাইয়া দিতে চায়, সে বিশ্ব-পুরুষের মহত্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃথা চেষ্টা করে। যে-কেহ তাহার নিম্নতন প্রকৃতির দুর্ব্বলতার জন্য ইহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায় (যেমন অর্জ্জুন প্রথমে চাহিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই ভগবান তাহার এই কাতরতাকে মিথ্যা কৃপা, অযশস্কর অনার্য্যসেবিত অস্বর্গ্য ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন) সে প্রকৃত ধর্ম্মের পথ অনুসরণ করিতেছে না, পরন্তু প্রকৃতির কর্ম্মের এবং জীবনের যে-সকল রূঢ়তর সত্য সেইগুলির সম্মুখীন হইবার অধ্যাত্ম সাহসেরই অভাব দেখাইতেছে। মানুষ যুদ্ধের নীতিকে অতিক্রম করিতে পারে কেবল তাহার মধ্যে অমৃতত্বের মহত্তর নীতির আবিষ্কার করিয়া। কেহ কেহ ইহাকে সেইখানে সন্ধান করেন যেখানে ইহা নিরন্তর রহিয়াছে, শুদ্ধ আত্মার ঊর্দ্ধতন স্তরসকলে, এবং ইহাকে লাভ করিবার জন্য তাহারা মৃত্যুর কবলিত সংসার হইতে সরিয়া যাইতে চাহেন। এইরূপে ব্যক্তিগত সমাধান মিলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মানবজাতির বা জগতের কোনই লাভ হয় না, অথবা শুধু এইটুকু ফল হয় যে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহাদিগকে যে তাহাদের ক্রমবিকাশের দুষ্কর পথে সাহায্য করিতে পারিত, সেই সাহায্যটুকু হইতেই তাহারা বঞ্চিত হয়।

তাহা হইলে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব, দিব্য কর্ম্মী, বিশ্ব-পুরুষের ইচ্ছার অবাধ যন্ত্র, তিনি যখন দেখিবেন যে, বিশ্ব-পুরুষ এক বিরাট বিপ্লবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সংহারক মহাকালরূপে লোকসকলকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উত্থিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাঁহাকেও স্থূল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারূপে অথবা লোকসকলের নেতা, দিশারী বা অনুপ্রেরকরূপে সম্মুখে আনা হইয়াছে (তাঁহার স্বভাবজ অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁহাকে এই এই অবস্থায় আনিবেই, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা), তখন তিনি কি করিবেন ? তিনি কি বিরত হইবেন, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবেন, ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রতিবাদ করিবেন ? কিন্তু বিরত হইয়া কোনও লাভ নাই, তাহাতে ঐ সংহারক ইচ্ছার পরিপূরণ নিবারিত হইবে না, বরং ঐ ছিদ্রকে ধরিয়া অনর্থ আরও বাড়িয়া উঠিবে। ভগবান বলিলেন, তুমি যুদ্ধ না করিলেও, আমার এই ধ্বংসের সঙ্কল্প পূর্ণ হইবেই, ঋতেঽপি ত্বাং। যদি অর্জ্জুন বিরত হন, এমন কি যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও সংঘটিত না হয়, সেই বিরতির ফলে অবশ্যম্ভাবী উপপ্লব, বিশৃঙ্খলা, আসন্ন ধ্বংস আরও দীর্ঘ, আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। কারণ এই সব জিনিষ কেবল আকস্মিক ঘটনা নহে, যে অনিবার্য্য বীজ রোপিত হইয়াছে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইবেই। তাঁহার প্রকৃতিও তাঁহাকে সত্য সত্যই বিরত হইতে দিবে না, প্রকৃতিঃ ত্বাম্ নিয়োক্ষ্যতি। গুরু শেষে অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন :—"অহঙ্কারের বশে তুমি যে জল্পনা করিতেছ, 'আমি যুদ্ধ করিব না', তোমার এ-সঙ্কল্প বৃথাই। প্রকৃতি তোমাকে তোমার কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেই। মোহের বশে তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ না, তোমার স্বভাবজনিত

স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া তোমাকে তাহা করিতেই হইবে" ।* তাহা হইলে কি অন্যপন্থা অবলম্বণ করিবে, স্থূল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া কোনরকম অধ্যাত্ম শক্তি, যৌগিক শক্তি ও প্রণালী প্রয়োগ করিবে? কিন্তু সেইটিও হইবে ঐ কর্ম্মেরই কেবল আর একটি রূপ; তাহাতেও ধ্বংস সংঘটিত হইবে, আর এই ভাবে যে অন্য পন্থা অবলম্বন তাহাও বিশ্বপুরুষেরই ইচ্ছা অনুসারে হইবে, ব্যক্তিগত অহংয়ের ইচ্ছা অনুসারে নহে। এমন কি ধ্বংসের শক্তি এই নূতন শক্তি হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়া আরও ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, এবং কালী আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভীষণতর অট্টহাসির রোলে জগৎকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। প্রকৃত শান্তি হইতেই পারে না, যতক্ষণ না মানুষের হৃদয় শান্তির যোগ্য হইয়া উঠিতেছে; বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যতক্ষণ না রুদ্রের ঋণ পরিশোধিত হইতেছে। তবে কি প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে? এই যে মানবজাতি এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে ইহাকে প্রেম ও ঐক্যের বাণী শুনাইতে হইবে? প্রেম ও ঐক্যধর্ম্মের প্রচারক থাকিবেনই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত ঐ পথেই মুক্তি আসিবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে কালধর্ম্ম যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন বাহিরের সত্যের পরিবর্ত্তে ভিতরের সত্য, দৃশ্যমান সত্যের পরিবর্ত্তে পরম সত্য

* যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ১৮।৫৯, ৬০

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া গেল, কিন্তু রুদ্র এখনও তাঁহার কবলে জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে স্বার্থপরতার ছিদ্রান্বেষী শক্তিসকল ও তাহাদের অনুচরগণের দ্বারা উৎপীড়িত অত্যাচারিত মানব তাহার অগ্রগতির জন্য ভীষণ ও দুরূহ সংগ্রামে বীর যোদ্ধার তরবারির সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, এবং মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে চাহিতেছে।

তাঁহার জন্য যে নির্দ্ধারিত শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা হইতেছে অহংভাবশূন্য হইয়া ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করা, যাহা ভগবদনির্দ্দিষ্ট বলিয়া দেখিতে পাইতেছেন তাহারই মানবীয় নিমিত্ত ও যন্ত্র হওয়া, তাঁহার মধ্যে, মানুষের মধ্যে, যে-ভগবান রহিয়াছেন সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখা, মাম্ অনুস্মরন্, তাঁহার প্রকৃতির অধীশ্বর তাঁহাকে যে-পথে চালাইবেন সেই পথই অনুসরণ করা। নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচীন্। কাহারও প্রতি তিনি ব্যক্তিগত শত্রুতা, ক্রোধ, ঘৃণা পোষণ করিবেন না, স্বার্থপর বাসনা বা আবেগের বশবর্ত্তী হইবেন না, দুর্দ্দান্ত অসুরের ন্যায় দ্বন্দের দিকে ধাবিত হইবেন না, উপদ্রব ও ধ্বংসের জন্য উন্মত্ত হইবেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্য করিবেন লোকসংগ্রহায়। কার্য্যটির উর্দ্ধে তিনি দৃষ্টিপাত করিবেন কার্য্যের লক্ষ্যের দিকে, যাহার জন্য তিনি যুদ্ধ করিতেছেন। কারণ মহাকালরূপী ভগবান ধ্বংস করেন শুধু ধ্বংসের জন্যই নহে, পরন্তু এক মহত্তর রাজ্য স্থাপনের, প্রগতিশীল বিবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য। বহির্মুখী মন যাহা দেখিতে পায় না, এই যুদ্ধের মহত্ত্ব, জয়ের গৌরব তিনি গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিবেন; যদি প্রয়োজন হয় তিনি সেই জয়েরই গৌরব গ্রহণ করিবেন যাহা পরাজয়ের ছদ্মবেশে

আসে, এবং মানুষকে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগের দিকেই লইয়া যায়। বিশ্বসংহারমূর্ত্তির আনন দর্শনে ভীত না হইয়া, তিনি ইহার মধ্যে দেখিবেন সেই শাশ্বত আত্মাকে যিনি সকল বিনশ্বর দেহের মধ্যে অবিনশ্বর, এবং ইহার পশ্চাতে দেখিবেন সেই চির-সারথির মুখ যিনি মানবের পথপ্রদর্শক, সর্ব্বভূতের সুহৃদ, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্। এই করাল বিশ্বরূপ দর্শন করা হইল, স্বীকার করা হইল, তাহার পর এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে এই আশ্বাসময় সত্যটিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; পরিশেষে শাশ্বতের এক অধিকতর হৃদয়গ্রাহী মুখ ও মূর্ত্তি দর্শন করান হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শন

দুই ভাব

সেই ভীষণ বিশ্বরূপদর্শনের প্রভাব তখনও অর্জ্জুনের উপর রহিয়াছে, সেই অবস্থায় অর্জ্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমেই যে-কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন সেগুলি এই মৃত্যু ও ধ্বংসমূর্ত্তির পশ্চাতে যে মহত্তর উৎসাহ ও আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে তাহারই নির্দ্দেশে পূর্ণ। তিনি বলিয়া উঠিলেন* "হে কৃষ্ণ, তোমার নামকীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ হৃষ্ট ও পুলকিত হয়, রাক্ষসকুল ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ অবনত-মস্তকে তোমাকে নমস্কার করেন—এ-সমস্তই যুক্তিযুক্ত ও যথোচিত। হে মহাত্মা! তোমাকে তাঁহারা কেনই বা নমস্কার না করিবেন? কারণ তুমিই আদি স্রষ্টা ও কর্ম্মকর্ত্তা, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমি অসৎ এবং তুমিই পরাৎপর। তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি আদি-দেব এবং তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই

---

* স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥ ১১।৩৬

পরম-ধাম ; হে অনন্তরূপ ! তোমার দ্বারাই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে*। যম, বায়ু, অগ্নি, সোম, বরুণ, সবই তুমি ; তুমি প্রজাপতি, জীবসকলের পিতা, এবং প্রপিতামহ। তোমাকে পুনঃ পুনঃ, সহস্র সহস্র বার নমস্কার, সম্মুখে তোমাকে নমস্কার, পশ্চাৎভাগে তোমাকে নমস্কার, সকল দিক হইতে তোমাকে নমস্কার, কারণ যাহা কিছু সে-সবই তুমি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম, তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তুমিই সব।

* কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নম নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নম পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

এই পরম বিশ্বপুরুষ এখানে মানব-মূর্ত্তি লইয়া নরদেহে তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি দিব্য মানব, দেহধারী ভগবান, অবতার—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি কেবল তাঁহার মানব স্বরূপটিই দেখিয়াছেন এবং ভগবানের প্রতি শুধু মানুষেরই মত ব্যবহার করিয়াছেন। পার্থিব ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার পশ্চাতে যে ভগবান বিরাজিত, মানবরূপটি যাঁহার কেবল একটি আধার, একটি প্রতীক মাত্র, তাঁহাকে তিনি দেখিতে পান নাই, তাই এখন তাঁহার অন্ধ অবহেলা ও অসতর্ক অজ্ঞানের জন্য তিনি সেই ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।* হঠকারিতার বশে তোমাকে কেবল আমার মানব সখা মাত্র জ্ঞান করিয়া, প্রমাদেই হউক বা প্রণয়েই হউক তোমার এই মহিমা না জানিয়া "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা" এইরূপ যত সব বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, বিহারে, শয্যায়, উপবেশনে, ভোজনে, একাকী বা তোমার সম্মুখে, তোমার প্রতি যত কিছু অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, আমার সে-সব অপরাধ ক্ষমা কর। এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি

---

* সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতা, তুমি পূজ্য, তুমি গুরু হইতেও গরীয়ান।* ত্রিজগতে তোমার সমানই কেহ নাই, তাহা হইলে হে অমিতপ্রভাব, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে? অতএব বন্দনীয় ঈশ্বর তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, আমি দেখিয়াছি ও

---

* পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যাকুল। হে দেব, তোমার সেই অন্য রূপ দেখাও। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার কিরীট-গদা-চক্রধারী রূপটি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্ত্তি, তোমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর।

প্রথমোক্ত কথাগুলি হইতেই ইঙ্গিত পাওযা যায় যে, এই করাল রূপসকলের পশ্চাতে যে-সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আশ্বাসময়, উৎসাহজনক এবং আনন্দপূর্ণ সত্য। এমন কিছু সেখানে রহিয়াছে যাহাতে ভগবানের সান্নিধ্যে, ভগবানের নামে জগতের হৃদয় হৃষ্ট ও পুলকিত হয়। ইহা সেই গভীর তত্ত্ব যাহার কল্যাণে আমরা কালীর করাল-বদনের মধ্যে মায়ের মুখ দেখিতে পাই, এমন কি ধ্বংসের মধ্যেই সর্ব্বভূত-সুহৃদের বরাভয়প্রদ হস্ত দেখিতে পাই, অশুভের মধ্যে শুদ্ধ অপরিবর্ত্তনীয় কল্যাণরূপকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতত্বের অধিপতিকে দেখিতে পাই। দিব্যকর্ম্মের অধীশ্বরের করালমূর্ত্তির সম্মুখ হইতে অন্ধকারের দুর্দ্দান্ত দানবীয় শক্তিসকল, রাক্ষসকল, নিহত পরাজিত অভিভূত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সিদ্ধগণ, যাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ের নাম জানেন ও কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার সত্তার সত্যে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রত্যেক রূপের সম্মুখেই প্রণত হন এবং জানেন প্রত্যেক রূপের মধ্যে কি বস্তু আছে এবং তাহার অর্থ কি; বাস্তবিক কাহারও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, ভয়ের কারণ আছে শুধু তাহাদেরই যাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে—অশুভ, অজ্ঞান, নিশা-চমূ, রাক্ষসী শক্তিসংঘ। করাল রুদ্রের যত গতি, যত ক্রিয়া সমুদয়েরই লক্ষ্য সিদ্ধি, দিব্য জ্যোতি ও পূর্ণতা।

কারণ এই যে আত্মা, এই ভগবদপুরুষ ইনি শুধু বাহ্যরূপেই সংহারক, এই সব সসীম বস্তুর ধ্বংসকর্ত্তা মহাকাল; কিন্তু নিজের সত্তায় তিনি অনন্ত, বিশ্বদেবগণের অধীশ্বর, তাঁহারই মধ্যে জগৎ এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া নিশ্চিতভাবে বিধৃত। তিনি আদি এবং সর্ব্বদা উদ্ভাবনশীল স্রষ্টকর্ত্তা, তিনি সৃষ্টিশক্তির মূর্ত্তরূপ ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান, তাঁহার যে ত্রয়ীভাব, স্থিতি ও ধ্বংসের সাম্যের দ্বারা বিচিত্রিত সৃষ্টি, ইহারই শুধু একটি ভাব রূপে তিনি ব্রহ্মাকে বিশ্বরূপের মধ্যে দেখাইয়াছেন। প্রকৃত যে দিব্য সৃষ্টি তাহা শাশ্বত; তাহা হইতেছে সসীম জিনিষের মধ্যে অনন্তের নিত্য প্রকাশ, পরমাত্মা তাঁহার অগণন অনন্ত জীবাত্মায়, তাহাদের কর্ম্মের মহিমায়, তাহাদের রূপের সৌন্দর্য্যে নিজেকে চিরকাল লুক্কায়িত ও প্রকটিত করিতেছেন। তিান সনাতন, অক্ষর; সৎ অসৎ, ব্যক্ত চির-অব্যক্ত, যে-সব জিনিষ ছিল কিন্তু এখন আর নাই বলিয়া মনে হয়, যে-সব জিনিষ আছে কিন্তু ধ্বংস হইবেই বলিয়া মনে হয়, যে-সব জিনিষ ভবিষ্যতে হইবে এবং লোপ পাইবে—এ-সব তাঁহারই দুই ভাব। কিন্তু এই সকলের উর্দ্ধে তিনি যাহা তাহা হইতেছে তৎ পরং, পরম পুরুষ, তিনি সকল নশ্বর জিনিষকে কালের এক আনন্তের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, সেখানে সবই চির-বিরাজমান। তাঁহার অক্ষর সত্তা রহিয়াছে কালের অতীত আনন্তে, কাল এবং সৃষ্টি তাহারই চির-প্রকাশমান রূপ।

তাঁহার এই যে সত্য, ইহার মধ্যেই সকলের সমন্বয় হইয়াছে; যুগপৎ ও পরস্পরসাপেক্ষ সত্যসকলের সামঞ্জস্য সেই এক সত্য হইতেই উদ্ভূত এবং এই সকলকে লইয়াই সেই সত্য এই সত্য হইতেছে পরমাত্মার,

যাঁহার পরমা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ সেই অনন্তেরই একটি নীচের রূপ; তিনি পুরাণ পুরুষ, কালের অন্তর্গত সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশধারার উপর তিনি অধ্যক্ষ হইয়া আছেন; তিনি আদিদেব, সকল দেব, মানব ও জীব তাঁহারই সন্তান, শক্তি, আত্ম-সত্তা, তাঁহারই সত্তার সত্যে সকলের আধ্যাত্মিক সার্থকতা; তিনি জ্ঞাতা, তিনিই মানুষের মধ্যে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দেন; তিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয়, যিনি মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মার সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রত্যেক নববিকাশ তাঁহারই আংশিক প্রকাশ, আর আমাদের যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাহাতে তিনিই অন্তরঙ্গ ভাবে, গভীর ভাবে, সমগ্র ভাবে দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত হন। তিনি উচ্চ পরম সংস্থান, পরং নিধানং, বিশ্বে যাহা কিছু আছে তিনিই সবকে সৃষ্টি করিতেছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার নিজেরই সত্তার মধ্যে জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বজয়ী শক্তি দ্বারা, তাঁহার অলৌকিক আত্মরূপায়ন, তেজ এবং অন্তহীন সৃষ্টির আনন্দের দ্বারা। তাঁহার অনন্ত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রূপসকলকে লইয়াই সমগ্র বিশ্ব। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সমস্ত দেবতাই তিনি, জীবগণের পিতা, সকলেই তাঁহার সন্ততি, তাঁহার প্রজা। তিনি ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সকল বিভিন্ন জাতির জীবগণের দিব্য স্রষ্টা যাঁহারা, তিনি তাঁহাদের পিতার পিতা, প্রপিতামহ। এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় পুনরাবৃত্তি করা হইল যে, তিনি সবই, প্রত্যেকটিই তিনি, সর্ব্বঃ। তিনি অনন্ত বিশ্বসত্তা আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা, প্রত্যেক

বস্তুই তিনি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এক শক্তি ও সত্তা রহিয়াছে তাহা তিনিই, তিনি অনন্ত তেজ যাহা অসংখ্য বস্তুসকলের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিতেছে, তিনি অপ্রমেয় ইচ্ছা এবং গতি ও কর্ম্মের মহতী বীর্য্য নিজের মধ্য হইতে কালের সকল প্রবাহ এবং প্রাকৃত জগতে আত্মার সমুদয় ঘটনাকে রূপ দিতেছেন, গঠন করিতেছেন।

এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়ায় মানুষের মধ্যে এই যে মহান ভগবান বিরাজ করিতেছেন তাঁহার কথা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। বিশ্বরূপ-দ্রষ্টার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ত্ব উপলক্ষিত হইল। প্রথমতঃ তাঁহার উপলব্ধি হইল, এই যে মানব-সন্তান পৃথিবীর একটি অনিত্য জীবরূপে তাঁহার পার্শ্বে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এক স্থানে ভোজন করিয়াছেন এবং যাঁহার সহিত তিনি কত ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে, মন্ত্রণা পরিষদে এবং সাধারণ ব্যাপারে কর্ম্মী হইয়াছেন, ইহার দেহে, মর মানবের এই মূর্ত্তিটির মধ্যে বরাবরই একটি মহান ও বিরাট তাৎপর্য্যপূর্ণ কিছু লুক্কায়িত ছিল,—এক দেবতা, এক অবতার, এক বিশ্বশক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক বিশ্বাতীত পরম সত্তা। এই যে গুহ্য দেবত্ব, যাহার মধ্যে মানুষ এবং তাহার সমগ্র ইতিহাসের তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে এবং যাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব-জীবন অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বপূর্ণ নিগূঢ় সার্থকতা লাভ করিতেছে, অর্জ্জুন এই দিকে অন্ধ ছিলেন। কেবল এখনই তিনি দেখিলেন ব্যষ্টি-আয়তনের মধ্যে বিশ্ব-আত্মা, মানবদেহের মধ্যে ভগবান, এই প্রতীক স্বরূপ প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাতীত পরম পুরুষ। দৃশ্যমান বস্তু সকলের এই যে বিরাট,

অনন্ত, অপ্রমেয় সত্তা, এই যে সীমাহীন বিশ্বরূপ যিনি প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপকে অতিক্রম করিয়া আছেন, আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপই যাঁহার আবাস গৃহ, অর্জ্জুন কেবল এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। কারণ সেই মহান সত্তা সমান এবং অনন্ত, ব্যষ্টিতে এবং বিশ্বে তিনি একই। আর প্রথমেই তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার অন্ধতা, ভগবানের প্রতি সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যবহার, তাঁহার সহিত কেবল মানসিক ও শারীরিক সম্বন্ধটি ছাড়া আর কিছু না দেখা—তাঁহার পক্ষে এ-সব হইয়াছে সেই মহান শক্তিময়ের বিরুদ্ধে পাপ; কারণ যাহাকে তিনি কৃষ্ণ, যাদব, সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি এই অপ্রমেয় মহত্ত্ব, এই অতুলনীয় বীর্য্য, এই সর্ব্বভূতস্থিত আত্মা যাঁহার সৃষ্টি এই বিশ্ব প্রপঞ্চ। মানবীয় তনুটিকে অবজ্ঞা না করিয়া সেইটিকে আশ্রয় করিয়া যিনি বিরাজিত তাঁহাকেই বিস্ময়, ভক্তি ও অনুরাগের সহিত তাহার দেখা ও উপাসনা করা উচিত ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেছে এই যে, মানবীয় রূপ এবং মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যাহা মূর্ত্ত হইয়াছে সেইটিও সত্য, বিশ্বরূপের করাল স্বরূপের সহিত সেইটি যুক্ত থাকিয়া আমাদের মনের কাছে উহাকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বাত্মক রূপ দেখিতে হইবে, কারণ তাহা ছাড়া মানবীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব নহে। সেই ঐক্যসাধক একত্বের মধ্যে সবকে লইতে হইবে। কিন্তু শুধু এইটির দ্বারা বিশ্বাতীত সত্তা এবং নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ এই সসীম জীবাত্মার মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে। অনন্ত স্বরূপের যে পূর্ণ তেজ, সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিগত প্রাকৃত মানবের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতার পক্ষে তাহা

অসহনীয়। একটি যোগসূত্র চাই যাহার সাহায্যে সে বিরাট বিশ্বপুরুষকে দেখিতে পারে নিজের ব্যষ্টিগত প্রাকৃত সত্তার মধ্যে, নিজের সন্নিকটে। তিনি শুধু তাঁহার বিশ্বব্যাপী ও অপ্রমেয় বীর্য্যের দ্বারা তাহার সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন না, পরন্তু মানবীয় মূর্ত্তিতে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাহাকে ঐক্যের মধ্যে তুলিয়া লইতেছেন। যে-ভক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব অনন্তের সম্মুখে প্রণত হয়, তাহা তখনই পূর্ণ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে এবং সখ্য ও ঐক্যের নিগূঢ়তম সত্যের সমীপবর্ত্তী হয়, যখন তাহা গভীর হইয়া অধিকতর অন্তরঙ্গ ভক্তিতে পরিণত হয়, ভগবানকে পিতারূপে অনুভব করা যায়, সখারূপে অনুভব করা যায়, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণমূলক প্রেমের অনুভব লাভ করা যায়। কারণ ভগবান মানব আত্মা, মানব দেহের মধ্যে বাস করেন; তিনি পরিচ্ছদের ন্যায় মানবীয় মন ও মূর্ত্তির দ্বারা নিজেকে আবরিত করেন। নরদেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা পরস্পরের মধ্যে যে-সব সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভগবানও সেই সব সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং ভগবানকে অবলম্বন করিয়াই সে-সব পায় তাহাদের পূর্ণতম সার্থকতা এবং মহত্তম সিদ্ধি। ইহাই বৈষ্ণব ভক্তি, এখানে গীতার কথাগুলির মধ্যে ইহার বীজ রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইহাদের অধিকতর গভীর, আনন্দময় ও সার্থকতাপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

আর এই দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেই আর একটি তত্ত্ব আপনিই উদ্ভূত হইতেছে। এই যে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষের রূপ, মুক্ত আত্মার শক্তির পক্ষে ইহা মহান, উৎসাহপ্রদ, সাহসপ্রদ, ইহা বীর্য্যের উৎস, এই

দর্শন সমতা সাধন করে, উন্নয়ন করে, সকল জিনিষের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়; কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অসহনীয়, ভয়ঙ্কর, দুর্ব্বোধ্য। এই যে সর্ব্বগ্রাসী কাল এবং ধারণাতীত ইচ্ছাশক্তির ভীষণ ও মহান রূপ, এই বিরাট অপ্রমেয় গহন কর্ম্মধারা, ইহার পিছনে যে আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে সেটিকে জানিলেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। কিন্তু আবার দিব্য নারায়ণের প্রসন্ন মধ্যবর্ত্তী রূপও আছে, সেখানে ভগবান মানুষের অতি সন্নিকটে, এবং তাহার মধ্যেই বিরাজিত, তিনি যুদ্ধে এবং যাত্রাপথে সারথি, সাহায্য করিবার জন্য তিনি চতুর্ভুজ, তিনি ভগবানের মানবীয় ভাবাপন্ন প্রতীক, এই সহস্রবাহু বিশ্বরূপ নহেন। নির্ভর করিবার জন্য মানুষকে এই মধ্যবর্ত্তী রূপটিই সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে। কারণ যে-সত্য আশ্বাস প্রদান করে, নারায়ণের এই রূপই তাহার প্রতীক। বিশ্বের কর্ম্মধারাসকল তাহাদের বিরাট আবর্ত্তন, পশ্চাৎগতি, অগ্রগতির ভিতর দিয়া মানুষের অন্তরাত্মা ও অন্তর্জীবনের পক্ষে যে বিশাল অধ্যাত্ম আনন্দে চরম পরিণতি লাভ করে, যেটি তাহাদের অত্যাশ্চর্য্য কল্যাণময় লক্ষ্য, সেইটি অন্তরঙ্গ, দৃশ্য, জীবন্ত, সহজবোধ্য হইয়া উঠে নারায়ণের এই সৌম্যমূর্ত্তির সাহায্যে। এই মানবীয় ভাবাপন্ন দেহধারী পুরুষের সহিত মিলন ও সান্নিধ্যই হয় তাহাদের পরিণাম,—মানুষের সহিত ভগবানের নিত্য সাহচর্য্য, মানুষ জগতে ভগবানের জন্যই জীবন যাপন করে, ভগবান মানুষের মধ্যে বাস করেন, এই রহস্যময় জগৎলীলাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের মধ্যে নিজের দিব্য ইচ্ছাসকলই পূর্ণ করেন। আর মানুষের এই পরিণামেরও পরে হইতেছে অধিকতর আশ্চর্য্যময়

ঐক্য, শাশ্বতের শেষ রূপান্তরসকলের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাস করা।

অর্জ্জুনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান তাঁহার স্বকীয় সাধারণ নারায়ণ রূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, স্বকং রূপম্, প্রসাদ ও প্রেম ও মাধুরী ও সৌন্দর্য্যের বাঞ্ছনীয় মূর্ত্তি*। কিন্তু অন্য যে বিরাট মূর্ত্তিটি তিনি সম্বরণ করিতেছেন সেইটির অপরিমেয় গূঢ়ার্থের কথা প্রথমেই বলিলেন। তিনি বলিলেন—"যাহা তুমি এখন দেখিতেছ, ইহা আমার পরম মূর্ত্তি, আমার তেজোময় রূপ, বিশ্বাত্মক, আদ্য, আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই।† আমি আমার আত্মযোগের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছি। কারণ ইহা আমার আত্মার, আমার নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তারই রূপ, এই রূপে পরাৎপর পরম পুরুষ নিজেকে বিশ্বলীলায় প্রকট করিয়াছেন; আমার সঙ্গে যে পূর্ণযোগে যুক্ত কেবল সে-ই এই রূপ অবিচলিত ভাবে দেখিতে পারে, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী কম্পিত হয় না, তাহার মন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না, কারণ ইহার বাহ্যরূপে

* ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

† ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

যাহা ভয়ঙ্কর ও দুঃসহনীয় আছে সে শুধু তাহাই দেখে না, কিন্তু ইহার মহান ও আশ্বাসময় নিগূঢ় মর্ম্মও উপলব্ধি করিতে পারে। আর তোমারও উচিত বিমূঢ় ও অবশ না হইয়া আমার এই ঘোর রূপ দর্শন করা* ; কিন্তু তোমার নিম্নতন প্রকৃতি এখনও ইহাকে সেই মহৎ সাহস ও স্থৈর্য্যের সহিত দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই, অতএব তোমার জন্য আমি পুনরায় আমার নারায়ণ রূপ ধারণ করিতেছি, তাহার মধ্যে মানুষের মন পৃথকভাবে, মানবীয় শক্তির অনুযায়ী প্রশমিত ভাবে সুহৃদরূপী ভগবানের সৌম্যভাব, আনুকূল্য ও আনন্দকে দেখিতে পায়। মহত্তর রূপটি অদৃশ্য হইবার পর ভগবান আবার বলিলেন,† "কেবল অসাধারণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মারাই ঐ রূপ দেখিতে পান। দেবতাগণই নিত্য এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায় না, ইহাকে

---

* মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

† সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪

দেখা যায়, জানা যায়, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় কেবল সেই ভক্তির দ্বারা যাহা সর্ব্বভূতে শুধু আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা করে, ভালবাসে।"

কিন্তু তাহা হইলে এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য যাহার জন্য ইহা এতদূর ধারণাতীত যে, মানবজ্ঞানের সকল সাধারণ প্রয়াস, এমন কি তাহার অধ্যাত্ম সাধনারও গভীরতম তপস্যা অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে সে রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না? তাহা এই যে, মানুষ অন্যান্য উপায়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার কোন একটি বিশেষ ভাবকে আংশিক-ভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারে, তাঁহার ব্যষ্টিগত বা বিশ্বাতীত রূপসকলকে জানিতে পারে, কিন্তু ভগবানের সকল ভাবের সমন্বয়মূলক এই যে মহত্তম ঐক্য, যাহাতে এক সময়ে একসঙ্গে একই রূপের মধ্যে সমস্ত প্রকটিত, সমস্ত অতিক্রমিত, সমস্ত সংসিদ্ধ—ইহাকে নহে। কারণ বিশ্বাতীত, বিশ্বগত, ব্যষ্টিগত ভগবান, আত্মা ও প্রকৃতি, অনন্ত ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীত ভাব, সৎ (Being) ও সম্ভূতি (Becoming), ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে, জানিতে চেষ্টা করি, কৈবল্যাত্মক সত্তাই হউক বা প্রকটিত বিশ্বলীলাই হউক, সবই এখানে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দর্শন লাভ করা যায় কেবল সেই অনন্য ভক্তি দ্বারা, সেই প্রেমের ও নিবিড় ঐক্যের দ্বারা যাহা পূর্ণ বিকশিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের মুকুটস্বরূপ। ইহাকে জানা, ইহাকে দর্শন করা, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা, পরম পুরুষের এই পরম রূপের সহিত এক হওয়া তখনই সম্ভব হয়, এবং এইটিকেই গীতা নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে।

এক পরম চৈতন্য আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা এবং তাঁহার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্ব্বভূতকে ধারণ করা সম্ভব হয়,—সকলের সহিত এক হইয়াও সকলের ঊর্দ্ধে থাকা, জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়। মন ও দেহের মধ্যে বন্দী সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে ইহা কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবান বলিলেন "আমার কর্ম্ম কর, আমাকে পরম পুরুষ, পরম বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, আমার ভক্ত হও, আসক্তি বর্জ্জন কর, সর্ব্বভূতের প্রতি বৈরিতাশূন্য হও; কারণ এইরূপ মানুষই আমাকে প্রাপ্ত হয়।"* অন্য কথায়, নিম্নতন প্রকৃতিকে জয়, সর্ব্বভূতের সহিত ঐক্য, বিশ্বাত্মক ভগবান এবং বিশ্বাতীত সত্তার সহিত একত্ব, কর্ম্মে ভগবদিচ্ছার সহিত ঐক্য, অদ্বিতীয় একের প্রতি, সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রেম,—ইহাই হইতেছে পন্থা যাহার দ্বারা মানুষ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম মুক্তি এবং সেই অচিন্ত্য রূপান্তর লাভ করিতে পারে।

* মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫

পথ ও ভক্ত

গীতার একাদশ অধ্যায়ে গীতাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি সাধিত হইয়াছে এবং তাহাকে কতকটা পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। দিব্য কর্ম্মের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে-আত্মা জগতের মধ্যে এবং ইহার জীবসকলের মধ্যে রহিয়াছে তাহার সহিত যোগে, জগতের হিতের জন্য সে-কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং বিভূতি সে আদেশ মানিয়া লইয়াছেন। শিষ্যকে তাহার সাধারণ মানবোচিত পুরাতন ভাব, তাহার অজ্ঞানের আদর্শ, উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থ চেতনা হইতে, শেষকালে তাহার অধ্যাত্ম সঙ্কটের সময় যে-সব আর তাহার কোন কাজেই লাগে নাই সে-সব হইতে তাহাকে ফিরান হইয়াছে। সেই প্রতিষ্ঠায় যে-কর্ম্মটিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ঘোর কর্ম্ম, ভয়াবহ প্রয়াসকেই তিনি এখন স্বীকার করিতে, এক নূতন অভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক সমন্বয়কারী মহত্তর জ্ঞান, এক দিব্যতর চৈতন্য, এক উচ্চ নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য, যে ভগবদিচ্ছা আদি জ্যোতি হইতে উৎসারিত হইয়া অধ্যাত্ম প্রকৃতির প্রেরণাশক্তি লইয়া জগতের উপর ক্রিয়া করিতেছে তাহার সহিত ঐক্যের আধ্যাত্মিক স্থিতি—ইহাই হইতেছে কর্ম্মের নূতন অভ্যন্তরীণ নীতি, ইহাই পূর্ব্বতন অজ্ঞান কর্ম্মকে রূপান্তরিত করিয়া দিবে। যে জ্ঞান ভগবানের সহিত ঐক্য স্থাপন করে এবং ভগবানের

পরম আত্মা। তিনি পরম ঈশ্বর, সকল কর্ম্ম ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রভু। তিনি একই সময়ে জীবের অন্তরপুরুষরূপে তাহার দেহ মন আত্মার মধ্যে বিরাজ করেন, আবার সে-সবকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ও পরমাত্মা, এবং এই সকল সমতুল্য রূপের মধ্যেই তিনি সেই এক শাশ্বত ভগবান। এই সমগ্র সমন্বয়সাধক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আত্মার চরম মুক্তিলাভের এবং প্রকৃতির কল্পনাতীত অচিন্ত্য সংসিদ্ধিলাভের প্রশস্ত দ্বার। এই যে-ভগবানে তাঁহার সকল রূপের সম্মিলন হইয়াছে, ইঁহারই উদ্দেশ্যে আমাদের কর্ম্ম, আমাদের ভক্তি, আমাদের জ্ঞানকে নিত্য অভ্যন্তরীণ যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে। এই যে পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, বিশ্বের অতীত. আবার ইহার আধারস্বরূপ আত্মা, ইহার অধিবাসী, ইহার অধিপতি, যিনি ঠিক এই ভাবেই কুরুক্ষেত্রের মহান বিশ্বরূপের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছেন, ইঁহারই মধ্যে মুক্ত আত্মাকে প্রবেশ করিতে হইবে; আর সে ইহা পারিবে যখন সে একবার তাঁহাকে তাঁহার সকল তত্ত্ব এবং সকল শক্তির সহিত জানিয়াছে, দর্শন করিয়াছে, যখন সে তাঁহার অনন্তমুখী ঐক্যকে ধারণা করিতে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ।

অদ্বিতীয় একের মধ্যে নির্মজ্জিত হইয়া জীবের ব্যক্তিগত সত্তার যে আত্ম-বিস্মৃত বিলোপসাধন, সাযুজ্যমুক্তি, গীতার মুক্তি তাহা নহে; ইহা একই সঙ্গে সকল প্রকারের মিলন। এখানে আছে পরম ভগবানের সহিত মূল সত্তায়, চৈতন্যের অন্তরঙ্গতায় এবং আনন্দের ঐক্যে সম্পূর্ণ সংযোজন, সাযুজ্য,—কারণ এই যোগের একটি লক্ষ্য হইতেছে ব্রহ্ম

হওয়া, ব্রহ্মভূতঃ। এখানে আছে পরমপুরুষের শ্রেষ্ঠতম সত্তার মধ্যে আনন্দময় চিরনিবাস, সালোক্য,—কারণ বলা হইয়াছে, তুমি আমার মধ্যে বাস করিবে, নিবসিষ্যসি মায্যেব। এখানে আছে ঐক্যসাধক সামীপ্যে অনন্ত প্রেম ও ভক্তি, এখানে মুক্ত জীব তাহার প্রেমাস্পদ ভগবানের আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তাহার সকল আনন্দের আধার আত্মায় পরিবৃত, সামীপ্য। এখানে আছে ভগবদ প্রকৃতির সহিত জীবের মুক্ত প্রকৃতির একত্ব, সাদৃশ্য মুক্তি,—কারণ মুক্ত জীবের সিদ্ধাবস্থা হইতেছে ভগবানেরই তুল্য হওয়া, মদ্‌ভাবমাগতাঃ, এবং সত্তার ধর্ম্মে, কর্ম্ম ও প্রকৃতির ধর্ম্মে তাঁহার সহিত এক হওয়া, সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ। প্রাচীনপন্থী জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হইতেছে এক অনন্ত সত্তার অতলতায় নিমজ্জিত হওয়া, সাযুজ্য; তাহা কেবল এইটিকেই পূর্ণ মুক্তি বলিয়া গণ্য করে। ভক্তিযোগ ভগবানের সামীপ্য কিম্বা তাঁহার মধ্যে নিত্য নিবাসকেই মহত্তর মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, সালোক্য, সামীপ্য। কর্ম্মযোগ চায় সত্তা ও প্রকৃতির শক্তিতে একত্ব, সাদৃশ্য। কিন্তু গীতা তাহার উদার সমগ্রতায় এই-সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে এবং সকলের সমন্বয় করিয়া এক মহত্তম, সমৃদ্ধতম দিব্য মুক্তি ও সংসিদ্ধিতে পরিণত করিয়াছে।

এই প্রভেদটি সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে দিয়া প্রশ্ন করান হইল। মনে রাখিতে হইবে যে, নৈর্ব্যক্তিক অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম যিনি একই সময়ে নৈর্ব্যক্তিক এবং দিব্য পুরুষ এবং এই দুইয়েরও বহু ঊর্দ্ধে, এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ (কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অহম্ মাম্ বলিতে যে ভাগবত "আমি" কে বুঝিয়াছেন তাহাতে এই মুখ্য প্রভেদটি উপলক্ষিত হইয়াছে), এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ভাবে, সঠিকভাবে এই প্রভেদটি করা হয়

নাই। আমরা বরাবর এই প্রভেদটি পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছি, যাহাতে প্রথম হইতেই গীতার বাণীর পূর্ণ মর্ম্মটি বুঝিতে পারা যায়, নতুবা এই মহত্তর সত্যের আলোকে নূতনভাবে দেখিয়া আমাদিগকে সেই একই কথা পুনরায় বলিতে হইত। অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রথমতঃ তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপকে এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ও অক্ষর আত্মার শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে, এ-শিক্ষা তাঁহার পূর্ব্ব ধারণাসকলের অনুযায়ীই হইয়াছিল এবং ইহা বুঝা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার সম্মুখে দেখান হইতেছে এই মহত্তম বিশ্বাতীত সত্তাকে, এই বিশালতম বিশ্বপুরুষকে এবং জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা ইহার সহিতই একত্বলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইতেছে। অতএব, এ-সম্বন্ধে যে সন্দেহ উঠিতে পারে তাহার সমাধান করা ভাল মনে করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে-সকল ভক্ত এইভাবে নিত্যযুক্ত হইয়া তোমাকে উপাসনা করে, ত্বাম্, এবং যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর আত্মার উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কাহারা?"* আত্মনি অথ ময়ি, "আমাতে, তাহার পর আত্মাতে", এই সব বাক্যের দ্বারা প্রথমেই যে প্রভেদ করা হইয়াছিল, এখানে সেইটিই পুনরায় সূচিত হইতেছে। অর্জ্জুন প্রভেদ করিলেন, ত্বাম্ আর অক্ষরম্ অব্যক্তম্। তাঁহার বক্তব্যের সার মর্ম্ম এই, তুমি সকল সত্তার পরম উৎস ও আদি, সকল বস্তুতে অনুস্যূতে ভগবদ সত্তা, তোমার রূপসকলের দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত শক্তি

* এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১২।১

তুমি, তোমার বিভূতি সকলের মধ্যে, জীবগণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রকট পুরুষ তুমি, তোমার মহীয়ান বিশ্বযোগের দ্বারা কর্ম্মের অধীশ্বররূপে জগতের মধ্যে এবং আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তুমি বিরাজিত। এই ভাবেই তোমায় আমাকে জানিতে হইবে, ভক্তি করিতে হইবে, আমার সকল সত্তায়, চেতনায়, চিন্তায়, অনুভবে ও কর্ম্মে তোমার সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে হইবে, সততযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলে এই যে অক্ষর সত্তা যাহা কখনও ব্যক্ত হয় না, কখনও কোন রূপ পরিগ্রহ করে না, সকল কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকে, সরিয়া দাঁড়ায়, জগতের সহিত বা ইহার কোনও বস্তুর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না, যাহা চির-নিস্তব্ধ, অদ্বিতীয়, নৈর্ব্যক্তিক, অচল—ইহার সম্বন্ধে কি? সকল প্রচলিত মতবাদ অনুসারে এই শাশ্বত আত্মাই হইতেছে মহত্তর তত্ত্ব, ব্যক্ত ভগবান একটি নিম্নতন রূপ; ব্যক্ত নহে, অব্যক্তই হইতেছে শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা। তাহা হইলে এই যে যোগ অভিব্যক্তিকে স্বীকার করে, এইটি কেমন করিয়া মহত্তর যোগ-জ্ঞান হইল?

শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন। "যাহারা আমার উপর মন নিবেশ করে, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী"*। তাহাই পরম শ্রদ্ধা যাহা সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখে,

* ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

যাহার দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত একই ভগবান। তাহাই পূর্ণতম যোগ যাহা ভগবানকে পায় প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কর্ম্মে এবং প্রকৃতির সকল সমগ্রতা দিয়া। কিন্তু যাহারা কঠিন পথ ধরিয়া অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরের অভিমুখে আরোহণ করিতে চায়, ভগবান বলিলেন, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়। কারণ তাহাদের লক্ষ্যে কোনও ভুল নাই, কেবল তাহাদের পথ অধিকতর কঠিন এবং তাহা ততখানি সম্পূর্ণ ও অখণ্ড নহে। অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য এখানে যে-ব্যক্ত অক্ষর সত্তা রহিয়াছে ইহারই মধ্য দিয়া তাহাদিগকে উঠিতে হয়, এবং তাহাদের পক্ষে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। এই ব্যক্ত অক্ষর সত্তা হইতেছে আমারই সর্ব্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি; বিরাট, অচিন্ত্য কূটস্থ, ধ্রুব, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ইহাই ক্ষর পুরুষের কর্ম্মকে ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে যোগদান করে না। মন ইহার মধ্যে অবলম্বন করিবার কিছুই পায় না; ইহাকে পাওয়া যায় কেবল এক নিশ্চল অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি দ্বারা, আর যাহারা শুধু ইহাকেই অনুসরণ করে তাহাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে সম্যকরূপে সংযত করিতে হয়, এমন কি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাহার করিতে হয়। তথাপি তাহাদের বুদ্ধির সমতা দ্বারা, সকল জিনিষের মধ্যে এক আত্মাকে দর্শনের দ্বারা এবং সর্ব্বভূতের হিতের জন্য স্থির শান্ত শুভ সঙ্কল্পের দ্বারা তাহারাও সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা তাহাদের সত্তার সকল ভাবে, সর্ব্বভাবেন, নিজেদিগকে ভগবানের সহিত

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ॥ ৪

সক্ত করে, এবং বিশ্বের বস্তুসকলের জীবন্ত উৎস অচিন্ত্য দিব্য পুরুষের মধ্যে সমগ্র ও পূর্ণভাবে প্রবেশ করে, ঠিক তাহাদেরই ন্যায় এই যে সব উপাসক এই অধিকতর কষ্টকর অনন্য একত্বের ভিতর দিয়া এক সম্বন্ধবিহীন অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে লাভ করিতে চায়, ইহারাও পরিশেষে সেই একই শাশ্বতকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ-পথটি তেমন সরল নহে এবং ইহা অধিকতর ক্লেশদায়ক। অধ্যাত্মভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির পক্ষে এইটি সমগ্র ও স্বাভাবিক গতি নহে।

আর ইহা মনে করাও ভুল যে, এই পথটি অধিকতর ক্লেশদায়ক সেই জন্যই ইহা উচ্চতর এবং অধিকতর ফলদায়ী প্রণালী। গীতার যে অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা তাহা অধিকতর দ্রুত, স্বাভাবিক ও সহজভাবে সেই একই পূর্ণ মুক্তির দিকে লইয়া যায়। কারণ ইহা ভাগবৎ পুরুষকে স্বীকার করে বলিয়া যে দেহধারী প্রকৃতির মানসিক ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বন্ধনসকলে আসক্ত হইয়া পড়ে তাহা নহে। বরঞ্চ ইহা জন্ম ও মৃত্যুর বাহ্যিক বন্ধন হইতে অচিরে নিশ্চিতভাবে মুক্তি আনিয়া দেয়*। অনন্য জ্ঞান পন্থার যোগীকে নিজের প্রকৃতির অশেষ প্রকার দাবীর সহিত কষ্টকর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হয়; তিনি তাহাদিগকে উচ্চতম ভোগ হইতেও বঞ্চিত করেন এবং তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তার ঊর্দ্ধমুখী প্রবৃত্তিগুলিকেও বর্জ্জন করেন যখনই তাহারা কোনরূপ সম্বন্ধের সূচনা করে অথবা নৈতিমূলক কৈবল্যাত্মক সত্তায় পৌছাইয়া দিতে অক্ষম হয় অন্য পক্ষে গীতার যে জীবন্ত পন্থা তাহা আমাদের

* তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭

সত্তার তীব্রতম ঊর্দ্ধমুখী গতিকে আবিষ্কার করে এবং সেইটিকে ভগবদ্-মুখী করিয়া জ্ঞান, সঙ্কল্প, অনুভব, সিদ্ধিলাভের স্বাভাবিক প্রেরণা, এই সকলকে শক্তিশালী সহায়রূপে ব্যবহার করিয়া পূর্ণ মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়। অব্যক্ত ব্রহ্ম তাহার অনির্দ্দেশ্য একত্বে এমন জিনিষ যে দেহধারী জীব ক্বচিৎ তাহাকে লাভ করিতে পারে, এবং তাহাও পারে কেবল সর্ব্বদা দুঃখ স্বীকার করিয়া, সকল অঙ্গকে নিগ্রহ করিয়া, প্রকৃতিকে কঠোরভাবে ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিয়া, দুঃখম্ অবাপ্যতে, ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্*। অনির্দ্দেশ্য অদ্বিতীয় সত্তা যাহারা তাহার নিকট উঠিয়া আসে সকলকেই গ্রহণ করে, কিন্তু কোনরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সাহায্য করে না, আরোহণকারীদিগকে ধরিবার মত কোনও অবলম্বন দেয় না। সবই করিয়া লইতে হয় কঠোর তপস্যার দ্বারা, কঠিন ও একক ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা। কিন্তু যাহারা গীতার পন্থায় পুরুষোত্তমের উপাসনা করে তাহাদের পথ কত পৃথক! যখন তাহারা অনন্যযোগে তাঁহাকে ধ্যান করে, কারণ তাহারা সবকেই বাসুদেব বলিয়া দেখে, তিনি প্রতি স্থানে, প্রতি মুহূর্ত্তে, অসংখ্য মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে দেখা দেন, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া ধরেন, এবং ইহার দিব্য ও সুখময় জ্যোতিতে সমগ্র জীবনকে প্লাবিত করিয়া দেন। জ্ঞানদীপ্ত তাহারা প্রত্যেক মূর্ত্তিতেই পরম আত্মাকে চিনিতে পারে, সকল প্রকৃতির ভিতর দিয়া একেবারেই তাহারা প্রকৃতির অধীশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, সকল সত্তার ভিতর দিয়া সকল সত্তার অন্তর্পুরুষকে

* ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ১২। ৫

প্রাপ্ত হয়, নিজেদের ভিতর দিয়া তাহারা নিজেরা যাহা কিছু সে-সবেরই আত্মাকে প্রাপ্ত হয়; ক্ষণমাত্রে শত দ্বার যুগপৎ বিদীর্ণ করিয়া তাহারা তাহাকে প্রাপ্ত হয় যাহা হইতে প্রত্যেক জিনিষের উৎপত্তি। অন্য প্রণালীটি কঠিন সম্বন্ধহীন স্তব্ধতার পথ, তাহা চায় সকল কর্ম্ম হইতে সরিয়া যাইতে, কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে ইহা অসম্ভব। আর এখানে সকল কর্ম্ম পরম কর্ম্মেশ্বরকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয় এবং তিনি পরম ইচ্ছাশক্তিরূপে যজ্ঞের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেন, ইহার সকল বোঝা তুলিয়া লন, এবং আমাদের মধ্যে দিব্য প্রকৃতির কর্ম্মের ভার নিজে গ্রহণ করেন। আর যখন ভক্ত বিপুল প্রেমাবেগে মানবের ও সর্ব্বভূতের দিব্য সখা ও প্রেমাস্পদের উপরে সমগ্র হৃদয় ও চিত্ত নিবেশ করে, তাঁহাতেই আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে, তখনও পরম পুরুষ সমুদ্ধর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তারূপে দ্রুত তাহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁহার মন, হৃদয়, দেহের সুখময় আলিঙ্গন দিয়া তাহাকে এই মৃত্যুসমাকুল সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন এবং শাশ্বতের চির-নিরাপদ বক্ষের মধ্যে তুলিয়া লন।

তাহা হইলে এইটিই দ্রুততম, উদারতম, মহত্তম পন্থা। ভগবান মানবাত্মাকে বলিলেন,* আমাতে তোমার সমস্ত মন স্থাপন কর, সমস্ত বুদ্ধি নিবেশ কর। আমি দিব্য প্রেম ও ইচ্ছা ও জ্ঞানের পরম জ্যোতিতে এই সকলকে অভিষিক্ত করিয়া ইহাদের উৎস আমারই মধ্যে তুলিয়া লইব। সংশয় করিও না, এই মরজীবনের ঊর্দ্ধে তুমি আমার মধ্যেই

---

* ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়॥ ১২।৮

বাস করিবে। যে অমর আত্মা শাশ্বত প্রেম, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের আবেগ, শক্তি ও জ্যোতিতে মহিমান্বিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র পার্থিব প্রকৃতির শৃঙ্খল তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অবশ্য এই পথেও বিঘ্ন আছে; কারণ নীচের প্রকৃতি রহিয়াছে তাহার প্রচণ্ড অথবা স্থূল নিম্নমুখী আকর্ষণ লইয়া, তাহা আরোহণের গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং উন্নয়ন ও ঊর্দ্ধমুখী উল্লাসের গতিপথ অবরুদ্ধ করে। ভাগবত চৈতন্যকে যখন কোন অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অথবা কোন প্রশান্ত ও প্রোজ্জ্বল অবকাশে প্রথম লাভ করা যায়, তখনও তাহাকে একেবারে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না, বা ইচ্ছামত পুনরায় ডাকিয়া আনা যায় না*; অনেক সময়েই ব্যক্তিগত চৈতন্যকে ভগবানে স্থির নিবিষ্ট করিয়া রাখা যায় না; জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসনের কত দীর্ঘ রজনী আছে, বিদ্রোহ, সংশয়, ব্যর্থতার কত প্রহর বা মুহূর্ত্ত আছে। তথাপি যোগ অভ্যাসের দ্বারা, এবং অনুভূতি উপলব্ধির পুনরাবৃত্তির দ্বারা সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য সত্তার মধ্যে বিকশিত হয় এবং প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়া লয়। মনের বহির্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও দুর্নিবারতার জন্য এইরূপ অভ্যাসও কি অতি কঠিন? তাহা হইলে সহজ পথ, কর্ম্মেশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম্ম করা, যেন মনের প্রত্যেক বহির্মুখী গতি সত্তার ভিতরের অধ্যাত্ম সত্যের সহিত সংযুক্ত হয়। তখন প্রাকৃত মানবের মধ্যে পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া

---

* অথ চিত্তং সমাধাতুম্ ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

উঠিবে, এবং ক্রমশঃ সে ইহার দ্বারা পূর্ণ হইয়া একটি দেবতায়, এক অধ্যাত্মপুরুষে পরিণত হইবে ; সকল জীবন হইবে ভগবানের নিত্য অনুস্মরণ, এবং সিদ্ধিরও বিকাশ হইবে, এবং মানবাত্মার সমগ্র জীবনের সহিত পরম ভাগবত সত্তার একত্ব বিকশিত হইবে।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ভগবানের এইরূপ নিত্য অনুস্মরণ এবং আমাদের সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে উৎসর্গ করা সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে সাধ্যাতীত বলিয়া অনুভূত হয়, কারণ স্মৃতিভ্রংশতা বশতঃ সে-মন কর্ম্ম এবং কর্ম্মের বাহ্যিক লক্ষ্যের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে ভগবানের দিব্য বেদীতলে অর্পণ করিতে ভুলিয়া যায়। তাহা হইলে পথ হইতেছে কর্ম্মে নীচের সত্তাকে সংযত করা এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করা*। সকল ফল বর্জ্জন করিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং, যে দিব্য শক্তি কর্ম্মকে পরিচালিত করিতেছে তাহার নিকট উৎসর্গ করিতে হইবে, অথচ সে-শক্তি প্রকৃতির উপর যে-কর্ম্মের ভার অর্পণ করে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ এই উপায়ে বাধা ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং সহজেই দূর হইয়া যায়, মন ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে এবং ভাগবত চেতনার মুক্তির মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করিতে সুযোগ পায়। আর এইখানে গীতা শক্তি অনুযায়ী সাধনার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে†। কোন প্রচেষ্টা ও অনুভূতির

---

* অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

† শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

পুনরাবৃত্তি, অভ্যাস, মহান ও শক্তিশালী বস্তু; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে জ্ঞান, বস্তু সকলের পশ্চাতে যে-সত্য রহিয়াছে চিন্তাকে তদভিমুখী করিয়া সফল ও জ্যোতির্ময় করিয়া তোলা; আবার এই মানসিক জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতেছে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সহিত সত্যকে নীরবে ধ্যান করা যেন চৈতন্য পরিশেষে ইহার মধ্যে বাস করিতে পারে এবং সর্ব্বদা ইহার সহিত এক হইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শক্তিশালী হইতেছে কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করা, কারণ তাহা অনতিবিলম্বে সকল রকম বিক্ষোভের কারণকে নাশ করে, এবং স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে অভ্যন্তরীণ স্থিরতা ও শান্তি স্থাপন করে, আর স্থিরতা ও শান্তিই হইতেছে সেই ভিত্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, এবং প্রশান্ত আত্মার অধিকারের মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। তখন চৈতন্য নিরুদ্বেগ হইতে পারে, সানন্দে নিজেকে ভগবানে নিবিষ্ট করিতে পারে এবং অবিচলিতভাবে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তখন জ্ঞান, সঙ্কল্প ও ভক্তি অটুট শান্তির সুদৃঢ় ভূমি হইতে শাশ্বতের আকাশের মধ্যে নিজেদের শিখর উন্নীত করিতে পারে।

তাহা হইলে যে-ভক্ত এই পন্থা অনুসরণ করিয়া শাশ্বতের অনুরক্ত হয় তাহার দিব্য প্রকৃতি কি হইবে, তাহার চেতনার ও সত্তার মহত্তর অবস্থাটি কি হইবে? গীতা প্রথম হইতেই যে সমতা, নিষ্কামতা ও অধ্যাত্ম মুক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছে, এথানে কয়েকটি শ্লোকে তাহাদেরই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বদা এইটিই হইবে ভিত্তি এবং সেইজন্য প্রারম্ভেই ইহার উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছিল। এবং সে সমতায় ভক্তি, পুরুষোত্তমের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ আত্মাকে এব

মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধির দিকে তুলিয়া লইয়া যাইবে, এই শান্ত সমতাই হইবে তাহার উদার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এই মূলগত সম-চৈতন্যের কয়েকটি সূত্র এখানে দেওয়া হইয়াছে।* প্রথমতঃ, অহংভাবের, "আমি" ও "আমার" ভাবের বর্জ্জন, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ। যিনি পুরুষোত্তমের ভক্ত তাঁহার হৃদয় ও মন বিশ্বপ্রসারিত, তাহা অহংয়ের সকল সঙ্কীর্ণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সেখান হইতে সর্ব্বভূতের প্রতি করুণা সর্ব্বতোমুখী সমুদ্রের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার থাকিবে সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রী ও করুণা, কোন জীবের উপরেই তাঁহার ঘৃণা নাই; কারণ তিনি ধৈর্য্যশীল, চির-সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশালী, তিনি ক্ষমার নির্ঝর। তাঁহার আছে কামনাশূন্য সন্তোষ, সুখে দুঃখে

* অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮

আনন্দে ও যন্ত্রণায় স্থির সমতা, অবিচলিত আত্মসংযম এবং যোগীজন-সুলভ দৃঢ় অটল সঙ্কল্প ও স্থিরনিশ্চয়তা এবং এমন প্রেম ও ভক্তি যাহা সমস্ত মন ও বুদ্ধিকে তাঁহার চৈতন্য ও জ্ঞানের অধীশ্বর ভগবানে অর্পণ করে। অথবা সংক্ষেপে তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিক্ষুব্ধ চঞ্চল নীচের প্রকৃতি হইতে এবং ইহার হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম প্রভৃতির তরঙ্গ হইতে মুক্ত, তিনি হইবেন শান্ত আত্মা, তাঁহার দ্বারা জগৎ সন্তপ্ত বা ব্যথিত হয় না, তিনিও জগতের দ্বারা সন্তপ্ত বা ব্যথিত হন না—তিনি শান্ত আত্মা, তাই তাঁহার নিকটে সকলেই শান্ত।

অথবা তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সকল কামনা ও কর্ম্ম তাঁহার জীবনের অধীশ্বরকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ ও শান্ত, যাহাই আসুক সকল বিষয়ে উদাসীন, কোন ফল, কোন ঘটনাব দ্বারাই তিনি ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হন না, তিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী অহঙ্কারের বশে, ব্যক্তিগত ভাবে ও মনের দ্বারা তিনি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কোন কর্ম্মই আরম্ভ করেন না, তিনি তাঁহার মধ্য দিয়া ভাগবত ইচ্ছা ও ভাগবত জ্ঞানকে তাঁহার নিজের সঙ্কল্প, ব্যক্তিগত অভিলাষ বা বাসনার দ্বারা বিচ্যুত না করিয়া অবাধে প্রবাহিত হইতে দেন, অথচ ঠিক সেই জন্যই তিনি তাঁহার প্রকৃতির সকল কর্ম্মে হন ক্ষিপ্র ও সুকৌশলী, কারণ পরম ভগবানের ইচ্ছার সহিত এই যে নিখুঁত ঐক্য, এই যে শুদ্ধ যন্ত্রভাব, ইহা হইতেই আসে কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌশল। আবার তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সুখের স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহাতে হর্ষান্বিত হন না, দুঃখের স্পর্শেও দ্বেষ করেন না বা তাহার ভারে শোকাচ্ছন্ন হন না। তিনি শুভ ও অশুভের প্রভেদ লোপ করিয়া

দিয়াছেন, কারণ তাঁহার ভক্তি তাঁহার শাশ্বত প্রেমিক ও প্রভুর হস্ত হইতে সকল জিনিষই সমানভাবে মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করে। যিনি ভগবানের প্রিয় ভগবদ্ভক্ত তাঁহার আত্মায় আছে উদার সমতা; শত্রু মিত্র, মান অপমান, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, মানুষের সাধারণ প্রকৃতি এই যে-সব দ্বন্দ্বে পীড়িত হয় এ-সবেরই প্রতি তাঁহার সমভাব। কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে, কোন স্থান বা নিকেতনে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না*; তিনি যেরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই থাকুন, মানুষ তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক, তাঁহার পদ বা ভাগ্য যাহাই হউক সবেতেই তিনি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। সকল জিনিষেই তাঁহার মন থাকিবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ, কারণ তাহা শ্রেষ্ঠতম আত্মায় নিত্য অবস্থিত এবং তাঁহার প্রেম ও ভক্তির একমাত্র পাত্র ভগবানে চিরনিবিষ্ট। সমতা, কামনাশূন্যতা এবং নীচের অহংভাবময় প্রকৃতির এবং তাহার দাবীসকল হইতে মুক্তি,—গীতা মহান্ মুক্তির সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ভিত্তিস্বরূপ সর্ব্বদা এইগুলিকেই প্রয়োজনীয় বলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার মূল শিক্ষা ও প্রথম প্রয়োজনটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে,—শান্ত জ্ঞানময় আত্মা যাহা সকল জিনিষের মধ্যেই এক অধ্যাত্ম সত্তাকে দেখিতে পায়, স্থির অহংভাবশূন্য সমতা যাহা এই জ্ঞানেরই ফল, নিষ্কাম কর্ম্ম যাহা এই সমতার মধ্যে কর্ম্মেশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়, মানুষের সমগ্র মানসিক প্রকৃতিকে মহত্তর অভ্যন্তরীণ ভাগবৎ সত্তার হস্তে সমর্পণ। আর এই সমতার শিখর হইতেছে সেই প্রেম যাহার ভিত্তি জ্ঞানে, যাহা যন্ত্রভাবে

* তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

কর্ম্ম করায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, যাহা সকল জিনিষ, সকল বস্তুর প্রতিই প্রসারিত, যে ভাগবত পুরুষ এই বিশ্বের স্রষ্টা ও অধীশ্বর, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্, তাঁহার প্রতি উদার একনিষ্ঠ সর্ব্বতোমুখী প্রেম।

এইটিই হইতেছে সেই ভিত্তি, সেই বিধান, সেই উপায় যাহা দ্বারা শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম মুক্তি লাভ করিতে হইবে; ভগবান বলিলেন, যাহাদের ইহা কোনরূপ আছে তাহারা সকলেই আমার প্রিয়, ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ। কিন্তু আমার অতীব প্রিয়, অতীব মে প্রিয়াঃ, হইতেছে ভগবানের নিকটতম সেই সকল ভক্ত যাহাদের ভগবদ্ভক্তি আরও উদারতর ও মহত্তর সিদ্ধির দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এই মাত্র আমি সেইটিরই পথ ও প্রণালী তোমাকে দেখাইলাম*। সেই সব ভক্ত পুরুষোত্তমকেই তাহাদের একমাত্র পরম লক্ষ্য করে এবং এই শিক্ষায় বর্ণিত অমৃত ধর্ম্ম ·র্ণতম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে। গীতার ভাষায় ধর্ম্ম শব্দের অর্থ হইতেছে, সত্তা ও তাহার কর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধ নীতি এবং অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে উৎসারিত এবং তদ্দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ম্ম, স্বভাবনিয়তম্ কর্ম্ম। মন, প্রাণ, দেহের যে নিম্নতন অজ্ঞান চৈতন্য তাহাতে আছে বহু ধর্ম্ম, বহু নীতি, বহু আদর্শ ও নিয়ম; কারণ মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির আছে বহু বিচিত্র রূপায়ন ও শ্রেণী। অমৃত ধর্ম্ম এক; তাহা উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাগবত চৈতন্য এবং তাহার শক্তি সকলের ধর্ম্ম। তাহা গুণত্রয়ের অতীত, এবং তাহা

---

* যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

লাভ করিতে হইলে এই সকল নীচের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হই সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। সে-সবের পরিবর্ত্তে শাশ্বতের এক মুক্তিও একত্বসাধক চৈতন্য ও শক্তিই হইবে আমাদের কর্ম্মের একমাত্র অনন্ত উৎস, আমাদের কর্ম্মের ছাঁচ, নিয়ামক শক্তি ও দৃষ্টান্তস্বরূপ আদর্শ। আমাদের নিম্নতন ব্যক্তিগত অহংভাবকে ছাড়াইয়া উঠা, শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী অক্ষরপুরুষের নৈর্ব্যক্তিক ও সমতাপূর্ণ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করা, সেই শান্তি হইতে আমাদের সকল প্রকৃতি, সকল সত্তার সমগ্র আত্মসমর্পণের দ্বারা অক্ষরেরও উপরে যে অন্যতর পুরুষ রহিয়াছেন, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে তদভিমুখী করা, ইহাই হইতেছে এই যোগের প্রথম প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষার শক্তিতেই আমরা অমৃত-ধর্ম্মে উঠিতে সক্ষম হই। সেখানে সত্তায়, চৈতন্যে ও ভাগবত আনন্দে শ্রেষ্ঠতম উত্তম পুরুষের সহিত এক হইয়া, তাঁহার পরম লীলাময়ী প্রকৃতি-শক্তির (স্বা প্রকৃতি) সহিত এক হইয়া মুক্ত আত্মা অনন্তভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অসীমভাবে ভালবাসিতে পারে, এক উচ্চতম অমৃতত্ব ও পূর্ণতম মুক্তির যথার্থ শক্তিতে অটল ভাবে কর্ম্ম করিতে পারে। গীতার অবশিষ্টাংশে এই অমৃত ধর্ম্মের উপরেই পূর্ণতর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে।